আমাদের পরিবেশ

(তৃতীয় শ্রেণি)

সত্যমেব জয়তে

বিদ্যালয়-শিক্ষা-দফতর পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

বিদ্যালয় শিক্ষা-দফতর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১২
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৩
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১৭

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণির 'আমাদের পরিবেশ' বইটি প্রকাশিত হলো। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' তৈরি করেন। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ' আমাদের পরিবেশ' বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলি তৈরি করার ক্ষেত্রে 'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫' এবং 'শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯' -এই দুটি নথিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আর অন্বেষণ প্রক্রিয়াকে হাতেকলমে ব্যবহার করার যথেষ্ট পরিসর বইটির মধ্যে রয়েছে। শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়ে কয়েকটি ভাবমূল (Theme)-কে ভিত্তি করে একদিকে যেমন বইটি রচিত, অন্যদিকে শ্রেণিকক্ষের চারদেয়ালের বাইরে যে বিশ্বপ্রকৃতির অবাধ ক্ষেত্র সেদিকেও শিক্ষার্থীর জানা-বোঝাকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস বইটিতে স্পষ্ট। আশা করা যায় বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান, সমাজ, ইতিহাস ও ভূগোল শিখনে তৃতীয় শ্রেণির 'আমাদের পরিবেশ' বইটি যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

একদল নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ বইটি প্রণয়ন করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ বিভিন্ন শ্রেণির বইগুলিকে রঙে-ছবিতে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

'আমাদের পরিবেশ' বইটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হবে। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কোণে বইটি যাতে যথাসময়ে পৌঁছে যায়, সেই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার গ্রহণ করবে। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের মতামত আর পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

মার্চ, ২০১৭

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি আমাদের সমগ্র পরিকল্পনায় আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি।

লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, '... শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময় প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।' ('শিক্ষাসমস্যা') 'আমাদের পরিবেশ' পর্যায়ের বইগুলিতে আমরা উদার প্রকৃতির সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের সংযোগ তৈরি করার চেষ্টা করেছি। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকৃতির সামনে নিয়মিত দাঁড়ায়, আমরা পাঠ্যপুস্তকে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছি। তৃতীয় শ্রেণি-র 'আমাদের পরিবেশ' বইটিতে একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস রয়েছে। প্রকৃতি এবং মানবজীবনের বিভিন্ন সম্পর্ক এই বইয়ের মধ্যে বিধৃত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'আমাদের পরিবেশ' পর্যায়ের বইগুলিতে আমরা পরিবেশ পরিচয়ের সূত্রে বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ইতিহাসের প্রাথমিক ধারণাগুলিকে সন্নিবিষ্ট করেছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন,পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

মার্চ, ২০১৭

নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অধ্যাপক অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অধ্যাপক রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

ডঃ দেবব্রত মজুমদার ডঃ সন্দীপ রায় অনির্বাণ মণ্ডল

পরামর্শ ও সহায়তা

অধ্যাপক এ.কে. জালালউদ্দিন
অধ্যাপক মিনহাজ হোসেন
বন্দনা সরকার ভট্টাচার্য
পার্থপ্রতিম রায়
সুদীপ্ত চৌধুরী

ডঃ শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য
অধ্যাপক মিতা চৌধুরী
ডঃ ধীমান বসু
বিশ্বজিৎ বিশ্বাস
নীলাঞ্জন দাস

ডঃ দেবীপ্রসাদ দুয়ারী
দেবাশিস মণ্ডল
প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী
রুদ্রনীল ঘোষ
ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী

অধ্যাপক সুমন রায়
সুব্রত হালদার
সুব্রত গোস্বামী
দেবব্রত মজুমদার
সঞ্জয় বড়ুয়া

পুস্তকসজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : দেবাশিস রায়

প্রচ্ছদলিপি : দেবব্রত ঘোষ

সহায়তা : সুব্রত মাজী, হীরাব্রত ঘোষ, বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

শরীর ১ - ৪২

খাদ্য ৪৩ - ৮৬

পোশাক ৮৭ - ১০৮

পরিবার ১৫১ - ১৮২

আকাশ ১৮৩ - ২১৪

সম্পদ ২১৫ - ২৪১

ঘরবাড়ি ১০৯ - ১৫০

সাবধানতা ২৪২ - ২৫৬

রংবাহার ২৫৭-২৫৯

আমার পাতা ২৬০

পাঠ্যসূচি ২৬১-২৬৩

মূল্যায়নের রূপরেখা ২৬৪-২৬৮

শিখন পরামর্শ ২৬৯-২৭৮

এই পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে কয়েকটি কথা

আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর রোগনির্ণয় ও তার চিকিৎসা বিষয়ে ১৮৯২ সালে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন:

"ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। ... একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ,ধারণাশক্তি ,চিন্তাশক্তি বেশ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।"

আমরা রবীন্দ্রনাথের এই রোগনির্ণয় ও চিকিৎসাবিধান মেনে এই 'পাঠ্যপুস্তক' তৈরি করার চেষ্টা করেছি। আমাদের আশা শিশু 'আনন্দের সহিত' এ-বই পড়বে। তাদের নিজেদের মধ্যে যেসব আলোচনা (কথা বলাবলি) করতে বলা হয়েছে তা 'আনন্দের সহিত' করবে। শ্রেণিকক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাদের কোলাহল ক্রমে তাদের আনন্দময় দলগত আলোচনায় রূপান্তরিত হতে থাকবে। পাড়ায় ও অন্যদের সঙ্গেও আলোচনা করবে 'আনন্দের সহিত'।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫-এ বলা হয়েছে **"Intelligent guessing must be encouraged as a valid pedagogic tool. Quite often children have an idea arising from their everyday experiences, or because of their exposure to media, but they are not quite ready to articulate it in ways that a teacher might appreciate it. It is in this 'zone' between what you know and what you almost know that new knowledge is constructed. Such knowledge often takes the form of skills, which are cultivated outside the school, at home or in the community. All such forms of knowledge must be respected"**

বাড়ির ও পাড়ার শিক্ষিত মানুষদের কাছে তো বটেই, অনেকসময় অনেক নিরক্ষর কাছের মানুষদের থেকেও তারা ধারনা (idea)পাবে। তার আগে ও পরে 'আনন্দের সহিত' এই বই পড়ার ফলে তাদের নতুন জ্ঞান-গঠন প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে। এর ফলে শুধু তাদের 'পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি' পেতে থাকবে এমন নয়, আত্মবীক্ষণ ও পরিবেশবীক্ষণ বিষয়ে তাদের 'গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ' করতে থাকবে।

তবে এত কিছু হঠাৎ হবে না। শিক্ষিকা ও শিক্ষক, অভিভাবিকা ও অভিভাবকদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এই সাফল্য অর্জন কোনোদিনই সম্ভব হবে না। তাই মুখ্যত তাঁদের উদ্দেশ্যেই এইসব কথা।

শিশুরা শ্রেণিকক্ষে কী করবে, শিক্ষিকা ও শিক্ষকরা কীভাবে তাদের সাহায্যকারী (facilitator) হয়ে উঠবেন তার উদাহরণ বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় রয়েছে। বাড়ির লোক ও পাড়ার লোকদের কাছে কী সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে তার উদাহরণও রয়েছে বইয়ের অনেক পৃষ্ঠায়।

হয়ত এরপর আর শিখন-পরামর্শ দরকার হবে না। তবু আমরা জানি, এই পথে আমরা সবাই প্রথম চলতে চাইছি। এত বিস্তৃত ক্ষেত্রে এপথে চলার কোনো অভিজ্ঞতার কথা আমাদের জানা নেই। তাই কিছু শিখন-পরামর্শ বইয়ের শেষে দেওয়া হল। আপনারাও ভাববেন, জানাবেন আপনাদের পরামর্শ।

আসুন, সবাই মিলে আমরা শিশুদের শৈশব কেড়ে না নিয়ে তাকে এমন বইয়ের সঙ্গে পরিচিত করাই যা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিক্ষাপুস্তক' নয়, 'পাঠ্যপুস্তক'।

আমাদের পরিবেশ

আমার নাম .....

আমার মায়ের নাম .....

আমার বাবার নাম .....

আমার রোল নম্বর .....

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম .....

আমাদের বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম .....

.....

আমাদের গ্রামের নাম/শহরের নাম .....

আমাদের জেলার নাম .....

রোজ বিকেলে নানা খেলা

ক্লাসে এসে দিদিমণি বললেন— কাল বিকালে কী কী খেলা হলো?

বিমল হেসে বলল— আমরা ফুটবল খেলেছি।

তিতলি বলল— জানেন দিদি, ও খুব ভালো খেলে।

— ফুটবল খেলায় পায়ের কাজ অনেক বেশি। খুব ছুটতে হয়।

হামিদ বলল— দিদি, আমরা ক্রিকেট খেলেছি।

রিনা বলল— ক্রিকেট খেলায় হাত ও পা – দুয়েরই অনেক কাজ। তাই না, দিদি?

— ব্যাট, বল করা, রান নেওয়া, ফিল্ডিং করা – সবেতেই হাত ও পায়ের কাজ।

বীণা বলল— আমরা কাল এক্কাদোক্কা খেলেছি। এক পায়ে লাফাতে গেলে পায়ের কাজ আরো বেশি হয়?

— পায়ের পাতা, গোড়ালি, হাঁটু – সবেরই কাজ হয়।

আমিনা বলল— তবে লুকোচুরি খেলতেও খুব ছুটতে হয়।

সাবিনা বলল— আমি রোজ স্কিপিং করি। তাতেও পুরো শরীরের কাজ হয়?

— নিশ্চয়ই। স্কিপিং-এ আঙুল, কবজি, কনুই, কাঁধ – সবেরই অনেক কাজ হয়। তাছাড়া পায়ের কাজ তো আছেই।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নীচে হাত আর পায়ের নানা অংশের ছবি আছে। সেগুলো কোনটা কী কাজ করে? ছবির পাশে লেখো :

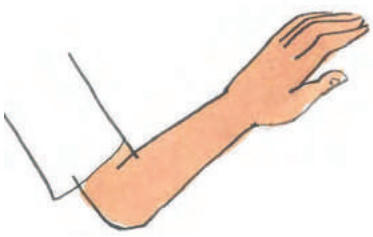

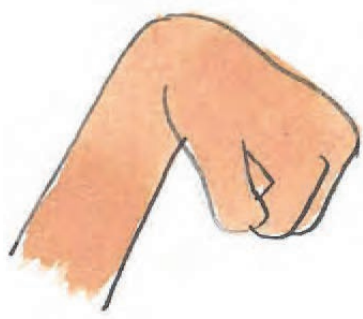

শরীর

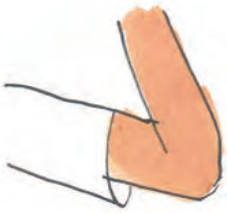

ঠিকঠাক খেলা আর ঠিকমতো শোনা

রিনা বলল--- দিদি, গতকাল আমরা কিন্তু কাবাডি খেলেছি।

আমিনা বলল— ওর দম খুব। ও যে দলে থাকে তারাই জেতে।

সীমা বলল— ও মিন মিন করে কবাডি কবাডি বলে। শোনা যায় না। দম নিয়ে নিচ্ছে কিনা বোঝা যায় না।

বিশু হেসে বলল— এই নিয়ে খুব ঝগড়া হয়। সীমা বলে, তুই দম নিয়েছিস। রিনা মানে না।

রিনা বলল— অন্যরা তো বলে না। ও কম শোনে। তাহলে আমি কী করব?

দিদিমণি জানতে চাইলেন— কী কারণে কানে শোনার অসুবিধে হয় জানো?

দিলীপ বলল— কান বুজে গেলে শুনতে অসুবিধে হয়।

— কানে ময়লা জমার কথা বলছ তো?

নিশা বলল— হ্যাঁ দিদি। কানে খোল জমে কান বুজে যায়।

— ঠিক বলেছ। কান পরিষ্কার করতে হয়। তবে সাবধানে করতে হয়। কানের ভিতর একটা পাতলা পর্দা আছে।

— কোথায়? দেখা যায় না তো!

— একটু ভিতরে আছে। তাতে আঘাত লাগলে খুব মুশকিল।

দিলীপ বলল— আমার দাদু আমার কান পরিষ্কার করে দেয়।

— ভালো করেন। কানের ময়লা পরিষ্কার করায় বড়োদের সাহায্য নেওয়াই ভালো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কীভাবে কী করো? কী করলে কী হয়? নীচে লেখো :

কী দিয়ে আমরা শ্বাস নিই?	
শ্বাস নিলে শরীরের কোন অংশ ফুলে ওঠে?	
শ্বাস নিলে শরীরের কোন অংশ ফুলে ওঠে?	
কথা বলার সময় শরীরের কোন অঙ্গ কাজ করে?	
কান ছাড়া মুখের আর কোথায় কোথায় নোংরা জমে?	

গা, হাত, পায়ের যত্ন

রবীন বলল— দিদি, খেলতে খেলতে আঙুলের নখের নীচেও খুব নোংরা জমে।

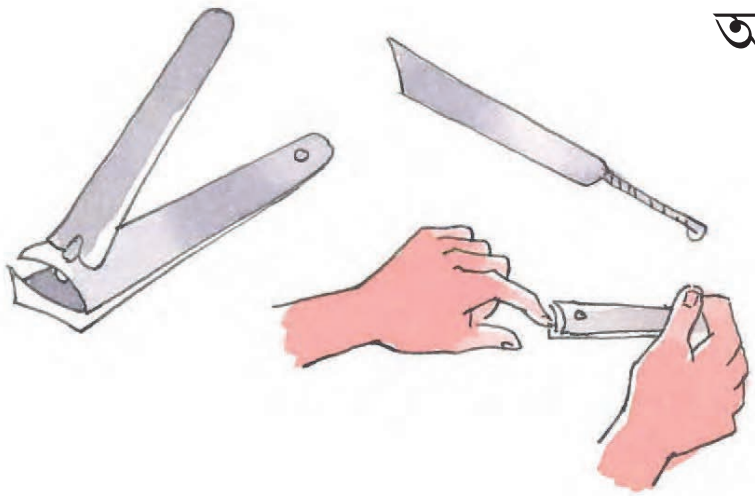

আমিনা বলল--- নখ পরিষ্কার করা সহজ। প্রথমে নেল-কাটার দিয়ে নখ কাটবি। তারপর সাবান দিয়ে ধুয়ে নিবি।

দিদিমণি বললেন— ঠিক বলেছ। সাবান লাগাবে। তারপর নখগুলো একটু ঘষে নেবে।

রিনা বলল— দিদি, নেল-কাটার কথাটা ইংরাজি তাই না?

— হ্যাঁ। নেল তো নখ। আর, যা দিয়ে কাটা হয় সেটা কাটার।

ঋজু বলল— ব্লেড দিয়েও নখ কাটা যায়।

রিনা বলল— তা যায়। তবে খুব সাবধানে কাটতে হয়। নইলে আঙুল কেটে যেতে পারে। আমার ঠাকুরদা নরুন দিয়ে নখ কাটে।

— আচ্ছা, কান আর নখ ছাড়া গায়ের আর কোথায় নোংরা জমে?

অসীম বলল— হাতে, পায়ে। গায়ের চামড়ার যেখানেই ভাঁজ, সেখানেই নোংরা জমে।

— যেখানে চোখ যায় না, সেখানেও নোংরা জমে। পিঠে, ঘাড়ে, কানের পিছনে।

দিলীপ বলল— কনুইতে জমে, পায়ের পাতায়ও নোংরা জমে।

— শীতকালে পায়ের পাতা নোংরা হলে খুব মুশকিল। পায়ের চামড়া ফেটে যায়।

হেনা বলল— গোড়ালিতেও নোংরা জমে। শীতকালে ফেটে যায়।

— সাবান দিয়ে ওই জায়গাগুলো পরিষ্কার করতে হয়।

দীপিকা বলল— সাবান মাখার পর ধুতে হয়। তারপর

ভিজে চামড়া হাত দিয়ে ঘষতে হয়। তাহলেই চামড়া পরিষ্কার হয়ে যায়। জুলেখা বলল— তারপর একটু তেল মাখলে আরো ভালো হয়।

— অনেক কিছুই তোমরা জানো দেখছি। সবাই নিয়মিত মাথা, গা-হাত-পা পরিষ্কার করবে। নখ বড়ো হলে কাটবে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নখ, মাথা, গা-হাত-পা পরিষ্কার করতে গিয়ে কী কী সমস্যা দেখেছ? নীচে লেখো :

বিষয়	কী সমস্যা হয়েছে	কীভাবে তা মিটেছে

সকালবেলা উঠে মোরা
দাঁতটি মাজি ভাই

পরের দিন। দিদিমণি ক্লাসে আসতেই রিহান বলল — দিদি, জিভেও তো খুব নোংরা জমে।

দিদিমণি বললেন— হ্যাঁ, সে তো জমেই। মুখ ধোও তো? তখন জিভছোলা দিয়ে জিভটা ঘসে নেবে। তারপর কুলকুচি করবে। জিভ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এমিলি বলল — দাঁতেও নোংরা জমে। মুখে গন্ধ হয়। তাইতো রোজ দাঁত মাজি।

— তবে দাঁত মাজারও নিয়ম আছে।

সবাই অবাক! দাঁত মাজার আবার নিয়ম!

— নীচের দাঁতে তলা থেকে উপরে ব্রাশ টানবে। আর উপরের দাঁতে উপর থেকে নীচে।

দিলীপ বলল — দিদি, চোখে আর নাকেও নোংরা জমে।

— নাক-চোখও পরিষ্কার করতে হয়।

পিকু বলল — নোংরাগুলো শক্ত হয়ে জমে গেলে একটু জলে ভেজালেই নরম হয়ে যায়। পরিষ্কার করা সহজ হয়। তাই না দিদি?

— এইতো বেশ জানো। সবাই রোজ সকালে দাঁত, জিভ, নাক, চোখ, মুখ সব পরিষ্কার করবে।

নাক, কান, চোখ, জিভ, চামড়া মিলে মিশে পাঁচজন আমরা

আমিনার নানা কী যেন ভাবছিলেন। আমিনা নানার কনুইয়ের কাছে পেনসিল দিয়ে ঠেলল। নানা আমিনার দিকে তাকালেন। বললেন — কোথায় পেনসিল ছোঁয়ালে বোঝা যায় বলো দেখি?

— চামড়ায়।

— গায়ের চামড়া যেখানে পাতলা সেখানে বেশি করে বোঝা যায়।

— সে তো সবাই জানে।

নানা হেসে বললেন— ধরো যদি কাঠিগজা দিয়ে গায়ে চাপ দাও? তাহলে ব্যথা লাগবে। কিন্তু গজাটা জিভে ছুঁলেই মিষ্টি! আবার, দিনের আলোয় চোখ বুজে থাকো। কিছু দেখতে পাবে না। চোখে আলো গেলে তবেই দেখতে পাবে। তেমনি, কানটা বন্ধ করে রাখো। ডাকলে শুনতে পাবে না। নাকটা ভালো করে চেপে রাখো। গন্ধ পাবে না।

আমিনা পরদিন স্কুলে এসব বলল। কাঠিগজা নিয়ে ওর নানার কথা শুনে বন্ধুরা খুব মজা পেল।

দিদিমণি বললেন— চোখ, কান, নাক, জিভ আর চামড়া, এই পাঁচটা অঙ্গকে বলে ইন্দ্রিয়। পাঁচটা, তাই পঞ্চেন্দ্রিয়।

তিয়ান বলল— গলা শুনেও কে ডাকছে বোঝা যায়।

রবীন বলল— খুব চেনা লোক হলে তবেই বোঝা যায়।

— হ্যাঁ। দেখে চেনা, আর গলা শুনে চেনা। দুটো আলাদা কাজ। যারা চোখে ভালো দেখে না, তারা কানটা খুব

কাজে লাগায়।

হীরা বলল— আমার ঠাকুমা চোখে দেখেন না। গলা শুনলে আমাদের চিনতে পারেন। ছুঁয়েও চিনতে পারেন।

— হ্যাঁ। একটা ইন্দ্রিয় অকেজো হলে অন্যগুলো আরো সজাগ হয়ে যায়। তাই তোমার ঠাকুমা না দেখেও চিনতে পারেন।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

১। ইন্দ্রিয়গুলোর কী কী কাজ নীচে লেখো :

ইন্দ্রিয়ের নাম	ইন্দ্রিয়ের কাজ
জিভ	খাবারের স্বাদ নেওয়া। নানারকম স্বাদের তফাত বোঝা।

২। নীচে একজন মানুষের ছবি আঁকো। মাথা, মুখ, গলা, হাত, পা ও আঙুল দেখাও। কোন অঙ্গ কী কাজ করে? অঙ্গগুলো কীভাবে পরিষ্কার করবে লেখো :

মানুষের ছবি ও নানা অঙ্গের নাম	ওই অঙ্গ দিয়ে আমরা কী করি	ওই অঙ্গগুলো কীভাবে পরিষ্কার করবে

কানামাছি খেলায় সবাই কানামাছিকে ঘিরে ছোটে আর বলে— কানামাছি ভোঁ ভোঁ / যাকে পাবি তাকে ছোঁ!

সেদিন দিদিমিণি খেলার নতুন নিয়ম ঠিক করে দিলেন। একটা দলে ছ-জন। একজন

কানামাছি। একজন রেফারি। অন্য চারজন একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াবে। ছুটবে না। প্রত্যেকে চারবার করে বলবে : কানামাছি ভোঁ ভোঁ / যাকে পাবি তাকে ছোঁ ! কানামাছি শুনবে। আন্দাজ করবে, শব্দ কোথা থেকে আসছে। তারপর খুঁজতে যাবে। এক মিনিটের মধ্যে ছুঁতে হবে। না পারলে অন্যরা আবার সরে যাবে। আবার চারবার করে কানামাছি ভোঁ ভোঁ বলবে।

এভাবে খানিকক্ষণ খেলা হলো। নতুন নিয়ম। খুব মজা। একটু পরে তিয়ান বলল— আর একটা নিয়ম হতে পারে। প্রথমে সবাই ঘুরতে ঘুরতে কানামাছি ভোঁ ভোঁ বলবে। তারপর রেফারি একজনকে বলতে বলবে। সে বলবে। কানামাছি গলার স্বর শুনে বলবে কার গলা।

দিদিমণি বললেন— বাঃ ! এও তো খুব মজার নিয়ম।

রবীন মোটা গলায় বলল— আমি অন্যরকম গলা করে বলব।

প্রকাশ বলল— দেখিস, তবু আমি ঠিক বুঝে যাব।

সীমা বলল— তাহলে প্রকাশই প্রথমে কানামাছি হোক। প্রকাশ কানামাছি হলো। তিয়ানের নিয়মে আবার খেলা শুরু হলো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কানামাছি খেলা তো হলো। এবার নীচে লেখো :

কানামাছি খেলার এই দুই নিয়মে কোন ইন্দ্রিয়টা চোখের বদলে কাজ করে?	
আর কী নতুন নিয়মে কানামাছি খেলা হতে পারে?	
যে নিয়মের কথা লিখেছ তাতে কোন ইন্দ্রিয়টা চোখের বদলে কাজ করে?	

চোখের মতো বন্ধু নেই

ক্লাসে এসে দিদিমণি বললেন— রিনা, কাল স্কুলে এলে না?

রিনা বলল— পেটের অসুখ হয়েছিল।

— আজকাল খুব এটা-সেটা খাচ্ছ। পেটের আর দোষ কোথায়? কথার মাঝে দিদি খেয়াল করলেন পিন্টু মাথা নীচু করে আছে। দিদি ডাকলেন। পিন্টু বলল— খুব মাথাব্যথা হচ্ছে দিদি। কদিন ধরে পড়তে গেলেই এমন হচ্ছে।

দিদি ওকে একটা বই পড়তে দিলেন। পিন্টু চোখের খুব কাছে বইটা ধরল। তবে পড়তে পারল।

দিদি বুঝলেন ও দূরের জিনিস খুব ভালো দেখতে পায় না। ওকে বললেন— তোমার বাবাকে কালই একবার স্কুলে আসতে বলবে। তোমায় চোখের ডাক্তার দেখাতে

হবে। হয়তো এজন্যই তোমার মাথাব্যথা করে। তোমাদের কি আর কারও এমন সমস্যা আছে? তাহলে হাত তোল।

বেশ কিছু হাত এদিক ওদিক থেকে উঠে পড়ল।

দিদিমনি বললেন---

ঠিকমতো দেখতে না পেলে এই সুন্দর পৃথিবীকে জানব কেমন করে?

রিনা বলল — ঠিকমতো দেখতে না পেলে আমাদের নানাকিছু শিখতেও অসুবিধা হবে।

— ঠিক বলেছ। চোখ আলো চিনে আমাদের দেখতে সাহায্য করে। তাই চোখের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। না নিলে খুব অল্প বয়সেই চশমা নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই দেখো না, আমি আবার কাছের জিনিস খুব ভালো দেখি না। তাই আমাকেও চশমা নিতে হয়েছে।

পল্টু বলল — আমার মাসতুতো ভাই রং চিনতে পারে না। তাই তার চিকিৎসা চলছে।

— আমাদের চোখে এমন কিছু জিনিস আছে যা আমাদের রং চিনতে সাহায্য করে। তোমার ভাইয়ের চোখে সেগুলো হয়তো ঠিকমতো কাজ করছে না।

ইমরান বলল — আমার বন্ধু তপন রাতের বেলায় ভালো দেখতে পায় না।

— তপনের মনে হয় রাতকানা রোগ হয়েছে। আসলে কি জানো, চোখ আমাদের সবকিছু দেখতে শেখায়। চিনতে শেখায়। শিখতে সাহায্য করে। তাই চোখের যত্ন নেওয়া খুব দরকার।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমাদের কার কী অসুখ হয়েছিল ? সেই অসুখে কোথায় কী কষ্ট হয়েছিল? কোন অসুখে কী কষ্ট হয় বাড়িতে বড়োদের কাছে জেনে নাও। তারপর নীচে লেখো :

অসুখের নাম	কোথায় কষ্ট ও কী কষ্ট

ইন্দ্রিয়দের সাড়া, সহজে বুঝতে পারা

মরিয়ম একটা গোলাপ এনেছে। ডালের ডগায় একটা ফুল, কয়েকটা পাতা। ডালের গায়ে ছোট্ট দুটো কাঁটাও আছে। জিয়ানা ফুলটা নিতে হাত বাড়াল। ধরার পরই আঃ ! করে ডালটা ছেড়ে দিল। দিলীপ আর হিমু দেখছিল। দিলীপ এগিয়ে এসে বলল— কাঁটা ফুটেছে? নাকি নাকে পোকা ঢুকল? জিয়ানা তখন আঙুল দেখছে। রক্ত বেরিয়েছে কিনা।

হিমু বলল— কাঁটাই ফুটেছে। কাঁটাটা ফুটতেই ছেড়ে দিয়েছে। তাই রক্ত বেরোয়নি।

জিয়ানার চোখে জল এসে গেছে। রক্ত বেরোয়নি, কিন্তু লেগেছে।

মরিয়ম ফুলটা জিয়ানার নাকের কাছে এগিয়ে ধরল। জিয়ানা দু-বার বড়ো করে শ্বাস টানল। কী দারুণ গন্ধ ! হেসে বলল— যেমনি কাঁটার খোঁচা, তেমনি ভালো গন্ধ ! দিদিমণি একটু দূর থেকে সবই দেখছিলেন। কাছে এসে

জিয়ানার আঙুলটা দেখলেন। হেসে বললেন— জিয়ানা, ব্যথা টের পেলে চামড়ায়। আর গন্ধ নিলে নাক দিয়ে। তাহলে নাক আর চামড়ার কাজ একসঙ্গে জেনে গেলে!

জিয়ানা ম্লান হেসে বলল— হ্যাঁ দিদি।

রিক্তা বলল— কিন্তু দিদি, কাঁটা ফুটল আঙুলে। তাহলে ওর চোখে জল এল কেন?

— তোমাদের এক বন্ধুর আঘাত লাগলে অন্যজনের কষ্ট হয় না? ওর একটা ইন্দ্রিয়ে আঘাত লাগল। অন্য একটা ইন্দ্রিয়ও তাতে কষ্ট পেল। চামড়াও যে একটা ইন্দ্রিয়।

দিলীপ বলল— দিদি, কেউ বকলেও চোখে জল আসে। কিন্তু, তখন তো কোনো ইন্দ্রিয়ে লাগে না?

— তখন ইন্দ্রিয়ে নয়, মনে কষ্ট হয়।

তিতলি বলল— ভয় লাগলেও কান্না পায়।

— হ্যাঁ। চারপাশের প্রভাবে ইন্দ্রিয়গুলো সাড়া দেয়। হঠাৎ অনেক আলো এসে পড়লে চোখ বুজে যায়। গরমে চামড়া থেকে দরদর করে ঘাম বেরোয়। ঠান্ডায় চামড়া ফেটে যায়। বাজ পড়ার শব্দে কানে তালা ধরে যায়। খুব ঝাল লাগলে জিভ জ্বালা করে। নাকে কিছু ঢুকে গেলেও নাক সুড়সুড় করে। আসলে ইন্দ্রিয়গুলো সবাই খুব সজাগ।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

চারপাশের প্রভাবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও মন কীভাবে সাড়া দেয় তা নীচে লেখো :

চারপাশের প্রভাব	ইন্দ্রিয়ের ও মনের সাড়া
কারোর বকুনি	চোখে জল আসা। কান্না পাওয়া। মনে দুঃখ হওয়া। রাগ হওয়া।
বাজ পড়ার শব্দ	

সাঁতরে চলা এপার ওপার

পাড়ায় একটা বড়ো পুকুর। নিজের নিজের বাড়ি থেকে হেঁটে এল এক দল ছেলেমেয়ে। দীপক, অরুণ, নীলিমা, জন, সোনাই, টিকাই, ডমরু, হাসান, বিল্টু, সাজিদা আরো অনেকে। কারো বা জলে নামতে ভয়। এখনও ভালো করে সাঁতার শেখেনি। কেউ আবার খুব ভালো সাঁতার জানে। স্কুলে সাঁতার প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে। টিকাই জলে নামার আগে ব্যায়াম শুরু করল।

জন বলল — তুই রোজ ব্যায়াম করে জলে নামিস। কেন বলত ?

টিকাই বলল — আগে একটু ব্যায়াম করে নিলে ভালো হয়।

— কী ভালো?

— আগে হাত-পা টান টান করতে হয়। একটু তাড়াতাড়ি শ্বাস নিতে হয়, ছাড়তে হয়। তারপর সাঁতার কাটতে নামলে ভালো সাঁতার কাটা যায়।

এদিকে অনেকে জলে নেমে গেছে। সাঁতরাতে শুরু করেছে। একবার ডান হাতটা তুলছে, একবার বাঁ হাতটা।

স্কুল বসতে তখনও দেড় ঘণ্টা দেরি। স্কুলের বড়দিমণি পুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ওদের দেখতে দেখতে গেলেন। ওরা কেউ তা জানল না।

দুপুরের খাওয়ার পর বড়দির ক্লাস। ক্লাসে এসে বড়দি বললেন— কে কে সাঁতার জানো? হাত তোলো।

অনেকে হাত তুলল। বড়দি দেখলেন তিনজন হাত তোলেনি। মৌমিতা, সফিকুল আর অ্যালিস।

দীপক আর সোনাই পাশাপাশি বসেছিল। ওদের দিকে চেয়ে বললেন— তোমরা মৌমিতা, সফিকুল আর অ্যালিসকে সাঁতার শিখিয়ে দেবে।

মৌমিতাকে বললেন--- সাজিদা শিখছে। তোমরাও শিখে নেবে।

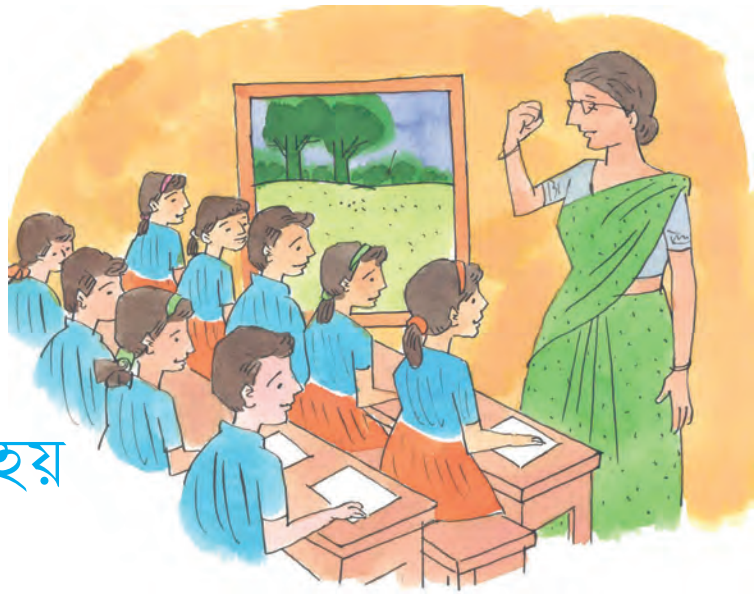

মৌমিতা ঘাড় নাড়ল।
এবার দিদি বললেন— সাঁতার কাটলে কী হয় বলত?

ডমরু বলল— খুব ভালো ব্যায়াম হয়।

— ঠিক বলেছ। আর একটু বুঝিয়ে বলো।

ডমরু বলল— হাত নাড়া হয়। পা নাড়া হয়। বুকে পিঠে জলের ধাক্কা লাগে। কোথাও ব্যথা-বেদনা হতে পারে না।

দিদি এবার নিজের কনুইয়ের কাছটা ভাঁজ করে দেখালেন। বললেন— ঠিক বলেছ। আবার দেখো, কবজির কাছে দুটো হাড়ের জয়েন্ট বা জোড়। এইরকম সারা শরীরে অনেক জোড় আছে। সাঁতার কাটলে ওইসব জোড়ের নাড়াচাড়া হয়। জায়গাগুলো সুস্থ থাকে।

অ্যালিস বলল— অন্য ব্যায়াম করলে হয় না?

— হয়। সব ব্যায়ামেই শরীরের উপকার। যেমন ধরো পিটি করা। তুমি দু-হাত উপরে তুলেছ। তাতে হাত আর কাঁধের জোড়ের নাড়াচাড়া হচ্ছে।

টিকাই বলল— কিন্তু সাঁতারে একসঙ্গে সব জোড়ের উপকার।

— ঠিক। আরো একটা কথা আছে। সাঁতার কাটলে বারবার লম্বা শ্বাস নিতে হয়। তাতেও শরীরের খুব উপকার হয়।

সফিকুল বলল— ফুটবল খেলার সময় খুব ছুটতে হয়। হাঁফিয়ে যাই। তখন লম্বা শ্বাস নিই।

হাঁটা, সাঁতার কাটায় ও খেলায় ব্যবহৃত অঙ্গের নাম

মৌমিতা বলল— দিদি, কাবাডি খেললেও তাই হয়। খুব হাঁফিয়ে যাই।

— তাও ঠিক। ফুটবল, কাবাডি, ব্যাডমিন্টন এসব খেলাও ভালো। শরীরের অনেক জায়গার ব্যায়াম হয়।

টিকাই বলল— সাঁতারে একসঙ্গে সব জায়গার ব্যায়াম হয়।

— হ্যাঁ। কম সময়ে হয়। আরো ভালো হয়। তাই সাঁতার কাটা খুব ভালো। তবে সাঁতার না জেনে গভীর জলে নামা ঠিক নয়।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

শরীরের কোথায় কোথায় হাড়ের জোড় আছে নীচে এঁকে দেখাও। হাঁটায়, বিভিন্ন খেলায় আর সাঁতার কাটায় শরীরের কোন কোন জায়গার ব্যায়াম হয় তা নীচে লেখো :

শরীরের একটা ছবি আঁকো। কোথায় কোথায় হাড়ের জোড় আছে তা ছবিতে ○ চিহ্ন দিয়ে দেখাও।	হাঁটায়, বিভিন্ন খেলা করায় আর সাঁতার কাটায় শরীরের কোন কোন জায়গার ব্যায়াম হয় তা লেখো।
	হাঁটা : ফুটবল খেলা : কবাডি খেলা : ক্রিকেট (বল করা) : ক্রিকেট (ব্যাট করা) : ক্রিকেট (ফিল্ডিং করা) : স্কিপিং করা : ব্যাডমিন্টন খেলা : সাঁতার কাটা :

চার পাশ, বারো মাস বন্ধুতে ভরা

রেহানা আর রিহান স্কুল থেকে ফিরে হাঁসদের ডেকে রোজ বাড়ি নিয়ে যায়। হাঁসগুলো সেই সকালে কুঁড়োমাখা খেয়ে জলে নামে। তারপর সারাদিন জলে থাকে।

রবিলাল আর পিরু রোজ মাঠে যায়। খেলার শেষে মাঠ থেকে গোরু আর ছাগল বাড়িতে আনে। মৌটুসির বিকেল কাটে তার বিড়ালের কাণ্ডকারখানা দেখে। রিমলির চড়াই আছে এক ঝাঁক। সকাল হলেই তারা চলে আসে। জানালার পাশে। রিমলি তাদের ধান খাওয়াবে। বেশি নয়। দু-মুঠো ধানেই ওদের হয়ে যায়। ধান ছড়িয়ে দিয়ে রিমলি মুখ ধুতে যায়।

টিকলুর একটা কুকুর আছে। টুনকির আছে শালিখ। টুনকি তাদের জন্য কেঁচো খুঁজে রাখে। ওরা এলে খাওয়াবে।

কুট্টুসের নজর টিকটিকি আর গিরগিটির দিকে। টিকটিকিরা ঘরের পোকা খায়। গিরগিটিরা গাছে গাছে ঘোরে। কেবলই রং বদলায়। কুট্টুস অবাক হয়ে দেখে।

টিপাই ফড়িং দেখে বেড়ায়। নানারকম ফড়িং। কেউ লাফায়। কেউ বা ওড়ে। তিন্নি প্রজাপতি দেখতে এ বাগান, সে বাগানে ঘোরে। রিন্টুরও শখ নানারকম প্রজাপতি দেখা। ইতু মাছেদের খাওয়ায়। নিজে খাওয়ার সময় পাতে একটু ভাত রেখে দেয়। সেগুলো নিয়ে চলে আসে পুকুর ঘাটে। জলে ছুঁড়ে দিলেই এক ঝাঁক মাছ চলে আসে।

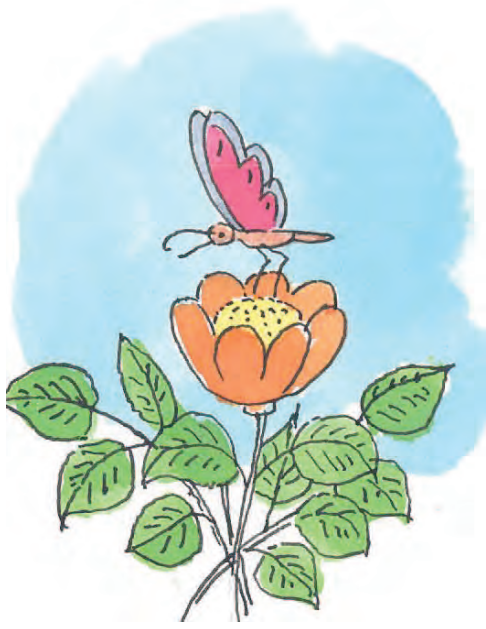

একদিন এসব নিয়ে কথা হচ্ছিল ক্লাসে। সবার কথা শুনলেন দিদিমণি। তারপর বললেন - বাঃ! তোমরা তো বেশ খেয়াল করে দেখেছ! এবার যে যাকে বেশি চেনো তার কথা অন্য বন্ধুদের বলো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

আগের পাতায় যাদের কথা হলো তাদের কী কী অঙ্গ আছে? ক-টা, কেমন? নীচে লেখো :

অঙ্গের নাম	গোরু	শালিখ/ কাক	টিকটিকি/ গিরগিটি	প্রজাপতি/ ফড়িং
পা	আছে / চারটে, বড়ো বড়ো			
নখ	আছে/ নাম: খুর ভোঁতা			
লোম	আছে/গা ভরতি নানা রং			
দাঁত	আছে/ ভোঁতা			
ডানা	নেই			
শিং	আছে/ দুটো শক্ত শক্ত			

অঙ্গের নাম	গোরু	শালিখ/ কাক	টিকটিকি/ গিরগিটি	প্রজাপতি/ ফড়িং
চোখ	আছে / দুটো বড়ো বড়ো			
পালক	নেই			

লাফাতে পারে কোন কোন প্রাণী	
উড়তে পারে কোন কোন প্রাণী	

মিল বেশি, পার্থক্য কম, এমন প্রাণীদের দল করো। একটা/দুটো করে নাম লেখা আছে, আরও নাম লেখো:

গোরু, ছাগল	চড়াই,	টিকটিকি,	কাতলা,	প্রজাপতি,

কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি পেয়ারা তুমি খাও

সাইনা পেয়ারা গাছের দিকে দেখিয়ে বলল— ওই দেখ আমার গুট্টু আর গুট্টি! ওরা আমার খুব প্রিয় বন্ধু। রোজ দেখা করতে আসে।

মিন্টু দেখল একটা কাঠবিড়ালি হাতে পেয়ারা ধরে খাচ্ছে। আর একটা দৌড়ে যাচ্ছে।

সাইনা বলল--- দেখছিস! আমাদের কাঠবিড়ালির হাত-পা আছে!

মিন্টু বলল— সত্যি? কাঠবিড়ালির হাত-পা থাকে?

সাইনা বড়োদের মতো করে বলল— দেখছিস না, গুট্টি কেমন চার পায়ে ছুটছে! ছোটার সময় সবগুলোই পা। আর গুট্টু কেমন দু-হাতে খাচ্ছে! খাওয়ার সময় সামনের দুটো পা হাত হয়ে যায়। হি হি!

— আমিও দেখেছি এরকম। চিড়িয়াখানায়। গিবন। শিম্পাঞ্জি।

— হনুমান দেখিসনি? সেও তো ওইরকমই।

— নারে। হনুমানের চেয়েও খাড়া দাঁড়ায় শিম্পাঞ্জি। প্রায় মানুষের মতো। যারা একটু সামনে ঝুঁকে দাঁড়ায় তাদের মতো। হাতে ধরে খায়। ঠিক যেন মানুষ!

— দু-পায়ে হাঁটে?

— না! হাঁটার সময় হাতগুলো সামনের পা হয়ে যায়।

— তাহলেও সুবিধে।

মিন্টু বুঝতে পারল না। বলল— কার সুবিধে? কী সুবিধে?

সাইনা বলল--- শিম্পাঞ্জিদের সুবিধে। কুকুর-ছাগলরা কোনো কিছুই হাতে ধরে খেতে পারে না। গায়ে কিছু কামড়ালে তা ছাড়াতে পারে না। গা ঝাড়াঝাড়ি করে।

এবার মিন্টু বুঝল। বলল— দুটো পা আর দুটো হাতের অনেক সুবিধে। শিম্পাঞ্জিরা গাছে উঠতে পারে। হাত দিয়ে গাছের ফল ছিঁড়ে তা ছুঁড়ে মারতেও পারে।

পরের দিন সাইনা মিন্টুকে ওদের স্কুলে নিয়ে গেল। দিদিমণিকে বলল— আমার মামাতো ভাই। কলকাতায় থাকে। জানেন দিদি, ও চিড়িয়াখানায় শিম্পাঞ্জি দেখেছে!

দিদিমণি বললেন— বাঃ। তাহলে আজ আমরা মিন্টুর কাছে শিম্পাঞ্জির কথা শুনি। চিড়িয়াখানার কথাও শুনব।

সবাই শিম্পাঞ্জি, চিড়িয়াখানার গল্প শুনল। সাইনার কাঠবিড়ালিদের কথাও উঠল। দিদি বললেন— হাত থাকার কত সুবিধে তা জানা হয়ে গেল।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

মানুষের চার পায়ের বদলে দু-পা আর দু-হাত। তাতে কিছু কিছু কাজ করতে মানুষের কি কি সুবিধে হয়? নীচে লেখো:

খেলা	
খাওয়া	
ঘুমানো	
চাষ করা	
মাছ ধরা	
রান্না করা	

মানুষের মতো আরো যারা

সকালবেলা। ঘুম থেকে উঠেই হীরামতি দেখল একটা নীল পাখি। জানালার বাইরে গাছে বসে আছে। ও পাখিটাকে ডাকল। পাখিটা যদি ওর জানালায় এসে বসে! কিন্তু পাখিটা ওর দিকে তাকালই না। উড়ে গেল। হীরামতি ভাবল, আমাদের যেমন হাত, পাখির তেমনি

ডানা। ওরাও যেন ডানা দুটো মেলে হাওয়ায় সাঁতার কাটে। ও মনে মনে ঠিক করল, আজ বন্ধুদের পাখিটার কথা বলবে।

মাছদের দেখে টিকাই ভাবে, ওদের কী মজা! যতক্ষণ খুশি জলে থাকতে পারে। কী করে পারে? ওদের কী আছে? আমাদের কী নেই? আমারও যদি তা থাকত! আমিও খালি সাঁতরে যেতাম।

স্কুলে যাওয়ার পথে ওরা এসব কথা বলাবলি করছিল। মানুষের কী কী আছে। অন্য জীবজন্তুদের কার কী আছে।

লাবণ্য বলল— মানুষ পাখির মতো উড়তে পারে না। কিন্তু উড়ে যাওয়ার জন্য উড়োজাহাজ বানিয়েছে।

ইসমাইল বলল— জানিস তো, মানুষ ডুবোজাহাজও বানিয়েছে। জলের অনেক নীচ দিয়ে বহু দূর যেতে পারে।

সাইনা বলল— মানুষের বুদ্ধি খুব। মানুষের সঙ্গে অন্য জীবজন্তুর আসল তফাত ওটাই।

ডমরু বলল— হনুমানেরও বেশ বুদ্ধি। অনেক কিছু মনে রাখে।

সাইনা বলল— শিম্পাঞ্জির বুদ্ধি আরও বেশি হতে পারে।

সব শুনে দিদিমণি বললেন— বাঃ। তোমরা বেশ ভেবেছ তো! যাদের চেনো তাদের কথাই ভাবো। কাক, অন্যান্য পাখি, বাঁদর, হাতি, কুকুর, বিড়াল কার বেশি বুদ্ধি। কার অন্য কী সুবিধে আছে।

দলে করি,বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

যাদের কথা বললে, ভাবলে তাদের সঙ্গে কোথায় কোথায় মানুষের মিল ও অমিল আছে তা নীচে লেখো :

যাদের সঙ্গে মানুষের বেশি মিল তাদের নাম	কী কী বিষয়েতারা প্রায় মানুষের মতো	কী কী বিষয়ে তাদের সঙ্গে মানুষের কিছুটা অমিল আছে
শিম্পাঞ্জি		
গিবন		
গোরিলা		
ওরাংওটাং		

জিভের জলের রহস্য

দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে। চার বন্ধু মাঠে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। ইতু এক মুঠো পাকা কুল এনেছে। হলুদ রং। কোনোটা আবার লালচে। গোল গোল। কুল দেখেই মৌমিতার জিভে জল এল। ভাবল, কাঁচা আম কাটা দেখলেও জিভে জল আসে। তেঁতুল দেখলেও আসে। লোকে ফুচকা খাচ্ছে দেখলেও

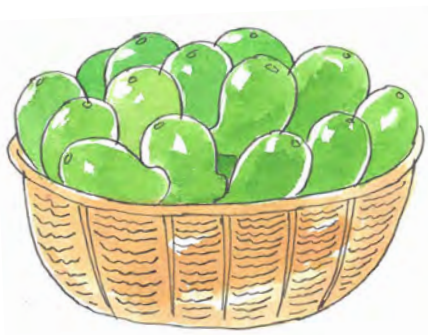

আসে। ফুচকার জন্য, নাকি তেঁতুল জলের টকের কথা ভেবে? কোনটার জন্য জিভে জল আসে?

দিদিমণি ক্লাসে ঢুকলেন। ইতু বলল—দিদি, কুল খাবেন?

দিদিমণি বললেন— বন্ধুদের দিয়েছ?

ইতু কিছু বলার আগেই মৌমিতা বলল— আচ্ছা দিদি, টক দেখলেই কি জিভে জল আসে?

দিদি কী বলবেন তা ভাবছিলেন। তা দেখে তপন বলল— দিদি, রসগোল্লা দেখলেও আমার জিভে জল আসে।

ডমরু বলল— আমার তো মাংস দেখলেও জিভে জল আসে।

এবার দিদি বললেন— ঝাল নোনতা চানাচুর দেখলে?

এমিলি বলল— তাতেও আসে।

দিদি হেসে বললেন— আসলে জিভের ওই জলকে বলে মুখের লালা। খাবার হজম করার কাজে লাগে। খানিকক্ষণ পর পর শরীর খাবার চায়। তখন খাবার দেখলেই জিভে জল আসে। পছন্দসই খাবার দেখলে এটা বেশি হয়।

তারপর একটু থেমে বললেন—

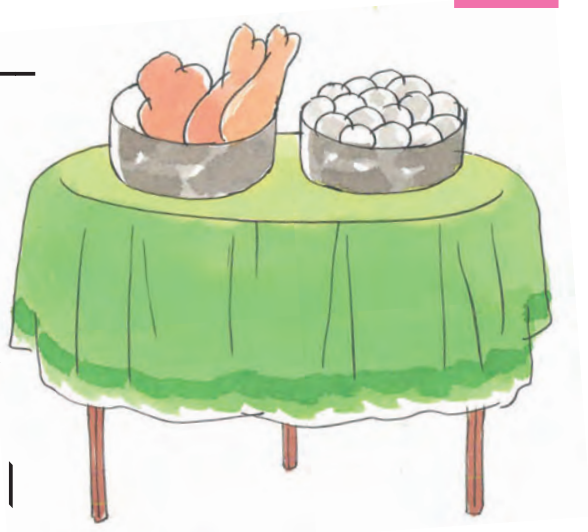

তেতো দেখে কারোর জিভে জল আসে?

কালু বলল— নিম-বেগুন ভাজা দেখলে আমার জিভে জল আসে।

— বেশ। তাহলে কী কী স্বাদের খাবারের কথা হলো?

পিকু বলল— টক, মিষ্টি, ঝাল, নোনতা, তেতো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

পাঁচরকম স্বাদের কথা হলো। এই পাঁচরকম স্বাদের কী কী খাবার খেয়েছ তা নীচে লেখো :

টক	মিষ্টি	ঝাল	নোনতা	তেতো

শাকপাতার খোঁজখবর

বৈশাখীর ঠাকুরদার মা বাগানে ঘুরে ঘুরে নানারকম শাক তোলেন। বেলে শাক, ব্রাহ্মী শাক, ঢেঁকি শাক, হিঞ্চে আরো কত কী! নিজেই কোটেন।

ঘরে হয়তো লাউ শাক কিংবা পুঁই শাক রান্না করা আছে। তবু কিছু ব্রাহ্মী শাক ধুয়ে, কুটে বৈশাখীর ঠাকুমাকে বললেন— বউমা, রান্না করে বুড়িকে দিও।

বৈশাখীকে উনি বুড়ি বলে ডাকেন। বৈশাখী ওঁকে বলে বড়োঠাকুমা।

খেতে বসে বৈশাখী বলল— বড়োঠাকুমা, এটা কী শাক?

বড়োঠাকুমা বললেন— এটার নাম ব্রাহ্মী শাক। খাও, উপকার পাবে।

বৈশাখী বলল --- আচ্ছা, কোনটা শাক আর কোনটা ঘাস কী করে চেনো?

বড়োঠাকুমা বললেন— চোখ মেলে দেখলেই বোঝা যায়। আমার সঙ্গে এক মাস বাগানে ঘুরলেই কোনটা শাক আর কোনটা ঘাস তা বুঝবে।

বৈশাখী ভাবল, কোনটা খাবার জিনিস আর কোনটা তা নয় – সেটা কী করে বোঝা যায়? স্কুলে গিয়ে দিদির কাছে জানতে চাইল সে কথা।

দিদিমণি বললেন— যা খেয়ে হজম করা যায় তা খাবার জিনিস, খাদ্য। ঘাস খেলে মানুষের হজম হবে না। তাই ঘাস মানুষের খাদ্য নয়।

মঙ্গলা বলল — দিদি, গোরুরা ঘাস হজম করতে পারে। তাই ঘাস গোরুদের খাদ্য?

— ঠিক। কিছু জিনিস আছে যার এক অংশ মানুষের খাদ্য। অন্য অংশ মানুষের খাদ্য নয়, কিন্তু চেনা জীবজন্তুদের খাদ্য।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কিছু জিনিসের এক অংশ মানুষের খাদ্য, অন্য অংশ চেনা জীবজন্তুর খাদ্য। নীচে সেগুলো লেখো :

মানুষের খাদ্য অংশ	মানুষের খাদ্য নয় কিন্তু চেনা অন্য জীবজন্তুর খাদ্য অংশ
১. আম ও লিচুর শাঁস,	আম, লিচু ও কাঁঠালের রস। কাঁঠালের কোয়া, বীজ। খোসা (গোরু, ছাগলের খাদ্য)
২.	মাছের নাড়িভুঁড়ি, কাঁটা (কুকুর, বিড়াল, কাকের খাদ্য)

খাদ্যের ভালোমন্দ

বাড়ি ফিরে সুহাস ভাবল, খাদ্য খেলেও তো অনেক সময় হজম হয় না। পেট খারাপ হয়। বমি হয়।

পরদিন স্কুলে এসে বলল সেকথা।

দিদিমণি বললেন— দুটো কারণে এমন হতে পারে। বেশি খেলে আর খারাপ হয়ে যাওয়া খাবার খেলে।

টিকলু বলল— খাবার খারাপ হয়ে যায় কী করে?

— ভ্যাপসা গরমে পচে যেতে পারে। বাসি হয়ে ভিতরে ভিতরে খারাপ হয়ে যেতে পারে। আবার ছাতা পড়েও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

তুতাই বলল— বেশি ঝাল দেওয়া খাবারও হতে পারে?

সানিয়া মজা করে বলল— ওঃ! তোর ঝাল সহ্য হয় না বুঝি?

এসব শুনে দিদি একটু হাসলেন। বৈশাখী বলল— দিদি,

বাসি, পচা সব যদি খারাপ খাদ্য হয় তাহলে ঘাসকে কী বলব? অখাদ্য?

— ঠিক। ঘাস মানুষের কাছে অখাদ্য।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

মানুষের খাদ্য আর অখাদ্যের তালিকা আছে। ওই তালিকায় আরও খাদ্য ও অখাদ্যের নাম লেখো:

খাদ্য	অখাদ্য
ভাত, রুটি, ...	খড়, ...
সরষে, ...	সরষের খোসা,.....
ফুলকপি, পালং শাক, ...	.....
ওল, কচু, ...	.....
আখ, তাল, ...	.....
আম, কমলালেবু, ...	.....

অনেকরকম শাকসবজি

গাছের পাতা, ডাঁটা, ফুল, কুঁড়ি, ফল, বীজ সবই আমরা খাই। ধানের বীজটার খোসা তুললেই চাল হয়। তা সিদ্ধ করলেই ভাত। গমেরও বীজ গুঁড়ো করে হয় আটা। জল দিয়ে মেখে আর বেলে, সেঁকে নিলেই রুটি।

কিন্তু ফুলকপিটা কী? ফুল, নাকি কুঁড়ি? সমীর বলল— কুঁড়ি। ফুটে গেলে ভালো সিদ্ধ হয় না।

রেবা বলল--- তাহলে পেঁয়াজকলিটা ফুলের বোঁটা নয়, কুঁড়ির বোঁটা।

বাড়িতে পেঁয়াজ দেখে সম্পৎ ভাবল, পেঁয়াজটা কী?

রিম্পা ভাবল, শিমের সবটাই খাদ্য। কিন্তু কড়াইশুঁটির শুধু বীজটা খাই। খোসা ফেলে দিই। গোরু খায়।

উচ্ছের বীজ রিনার খুব অপছন্দ। বীজ ফেলে খায়। তবে পটলের বীজ কচি থাকলে খেয়ে নেয়। রিনা ভাবতে লাগল, উচ্ছে, পটল এসবের বীজ কি খাদ্য ? না অখাদ্য ?

পরদিন দিদিমণিকে সবাই এসব ভাবনার কথা বলল।

শুনে দিদি বললেন— পেঁয়াজ হলো গাছের কাণ্ড! ধান, গম, ডাল এইসবের বীজটাই খাদ্য। শিম, কড়াইশুঁটিরও তাই।

সম্পৎ বলল— শিম, বরবটি, বিন কচি থাকলে ? তখন তো সবটাই খাওয়া যায়।

— ঠিক বলেছ। তবে উচ্ছে, পটল, লাউ এসবের বীজ একটু পুষ্ট হয়ে গেলে আর ভালো খাদ্য থাকে না। হজম হয় না। খুব কচি বীজ অবশ্য খাওয়া যায়।

আয়েষা বলল— দিদি, সজনে ডাঁটা কিন্তু ডাঁটা নয়, সজনের ফল। ভিতরে বীজ থাকে। খুব পেকে গেলে অখাদ্য !

— ঠিক বলেছ। শাক গাছ বড়ো হলে তার ডাঁটা খাই আমরা। নটে ডাঁটা, পুঁই ডাঁটা। ওগুলো ওইসব শাকগাছের কাণ্ড।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কোন গাছের কোন অংশ আমাদের খাদ্য? সেগুলো নীচে লেখো :

পাতা	ডাঁটা/কাণ্ড	বোঁটা	কুঁড়ি	ফুল	ফল	বীজ
		পান				
		পেঁয়াজকলি				

শাকপাতা তরকারি
খাওয়া খুব দরকারি

তুতাইরা কাঁচা শশা, টম্যাটো, পেঁয়াজ, গাজরের স্যালাড খায়। তুতাই একদিন বাড়ির পাশের সবজি বাগানে ঘুরছে। ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙে, কাঁকুড় হয়েছে।

হঠাৎ ও ভাবল, ঢ্যাঁড়শ কি কাঁচা খাওয়া যাবে? দেখি না খেয়ে! ঝাল তো আর নয়! একটা ঢ্যাঁড়শ তুলে খেয়ে দেখল। খেতে মন্দ নয়। তবে একটু ভয় হলো। হজম হবে তো? কাঁচা ঢ্যাঁড়শ কি খাদ্য? স্কুলে গিয়ে টিপাইকে সব বলল। টিপাই হেসে বলল--- আমি কত খেয়েছি! কচি ঝিঙে, কাঁকুড় খেয়ে দেখিস। সব হজম হয়ে যাবে।

দিদিমণি এলে তুতাই জানতে চাইল— শশার মতো কী কী জিনিস কাঁচা খাওয়া যায়, দিদি?

দিদিমণি বললেন— কচি থাকলে

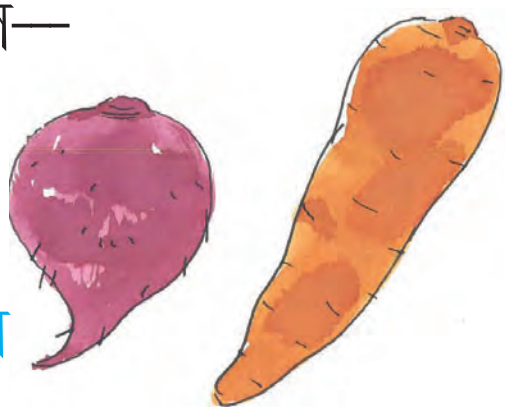

অনেক রকমের আনাজ কাঁচা খাওয়া যায়। একসময় তো মানুষ রাঁধতে শেখেনি। সবই কাঁচা খেত। তোমরাও খেতে পারো। তবে কোনো আনাজ কাঁচা খেলে ভালো করে ধুয়ে নিও।

ফতেমা বলল— দিদি, সবজি আর আনাজ একই কথা?

— কেউ বলেন সবজি। কেউ বলেন আনাজ। রান্নার পরে বলে তরকারি। আবার কাঁচা আনাজকেও অনেকে তরকারি বলেন। কিছু কিছু আনাজের নানা নামও আছে। যেমন হোপা আর চিচিঙ্গা, একই আনাজ।

তুতাই বলল— ট্যাঁড়শ আর ভেন্ডি, একই আনাজ।

মঙ্গলা বলল— দিদি, আলু কি আনাজ?

— হ্যাঁ। রাঙা আলু, মেটে আলু সবই। এককথায় মাটির নীচের সবরকম আলুই আনাজ।

সাগিনা বলল— দিদি, ওল, কচুও কি আনাজ?

— হ্যাঁ। তবে ওল, কচু যেন কাঁচা খেতে যেও না।

জন বলল— দিদি, কী শাক খেলে কী উপকার?

বৈশাখী চট করে বলল— আমি জানি। ব্রাহ্মী শাক খেলে উপকার হয়। আমার বড়োঠাকুমা বলেছে।

— অনেকে তাই বলেন। তবে ভাজলে খেতেও ভালো লাগে।

কালু বলল— আর নিমপাতার কী উপকার?

দিদি হেসে বললেন— নিমপাতা খোস-পাঁচড়া হতে দেয় না।

রমজান বলল— আর আনাজ? কোন আনাজের কী উপকার?

— কাঁচকলা রক্তাল্পতায় উপকারী। পেঁপে হজম করায় সাহায্য করে। বিট-গাজরের মতো রঙিন সবজি অনেক গুরুতর রোগ প্রতিরোধ করে।

দিলীপ বলল— দিদি, মোচা খেলে কী উপকার হয়?

— তুমি মোচা ভালোবাসো? মোচাও রক্তাল্পতার সমস্যা কমায়। শোনো, অনেক রকম শাক। অনেক রকম আনাজ। এসব থেকে অনেক ওষুধও তৈরি হয়। সব কি আর আমি জানি? এসব নিয়ে সবাই বাড়ির বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করবে। তারপর স্কুলে এসে নিজেদের মধ্যেও কথা বলবে।

রীতা বলল--- আমাদের পাড়ার নরেনদাদু তো কবিরাজ। সবাইকে শাক-সবজি খেতে বলেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করব?

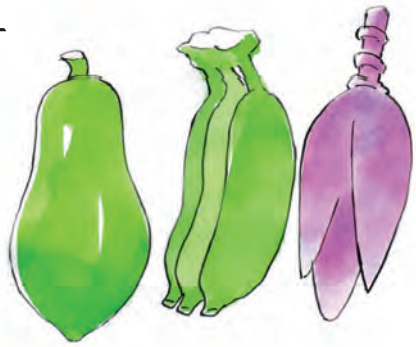

— তাহলে আরো ভালো হয়। অন্য চেনা ডাক্তারদের সঙ্গেও কথা বলতে পারো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নানারকম শাক, পাতা, আনাজের নাম ও সেগুলো খেলে কী উপকার হয় তা নীচে লেখো :

শাক-পাতা আনাজের নাম	খাওয়ায় কী উপকার

ফল খাওয়ার সুফল

জল আর ফল। শরীরের দুটোই চাই। হজমে সাহায্য করে জল। তাছাড়া খাদ্যের সঙ্গে আমরা কিছুটা অখাদ্য খেয়ে ফেলি। সেই অখাদ্য শরীর থেকে বের করতেও সাহায্য করে জল। তাই দিনে অন্তত দুই-তিন লিটার জল খেতে হবে।

নানারকম ফল শরীরের দরকার। ফলের শাঁসে আর রসে অনেক কিছু থাকে। সেগুলো শরীরের জন্য খুব দরকারি। সেই দরকারি জিনিসগুলো অন্য কোনো খাবার থেকে পাওয়া যায় না। এটুকু শুনেই ইমরান বলল— দিদি, অসুখ হলে মা ফল খেতে দেন।

দিদিমণি বললেন— বেশিরভাগ ফল সহজে হজম হয়। অসুখ-বিসুখ হলে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো খুব নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তখন শরীর সব খাদ্য হজম করতে পারে না। তাই ফল খেলে ভালো হয়। আবার রোগ আটকাতেও ফল দরকার। অন্য খাবার কম খেয়ে ফল বেশি খেলে মোটা হওয়ার সম্ভাবনা কমে।

মীনা বলল— ফল খেতেও খুব ভালো। আবার ফলে জল থাকে প্রচুর।

— অনেকে জল খেতে চায় না। ফল খেলে তাদের শরীর জলও পেয়ে যায়।

রেহানা বলল— একটা ফল খেলে আর জল খাওয়াই লাগে না।

রাসু বলল— ডাবের কথা বলছিস তো? কিন্তু ডাব কি ফল? ডাবে তো শুধুই জল থাকে!

— অনেকে তাই বলেন। কিন্তু আমার মনে হয় আরো কিছু থাকে। নইলে খেতে অন্যরকম হয় কী করে? পেটের

অসুখ হলে ডাবের জলে তো খুব উপকার হয়! তারপর একটু থেমে বললেন— ডাব গাছে হয়। ফল তো বটেই। পাকলে নারকেল বলে। বীজের মধ্যে শাঁস থাকে। সেটাই আমরা খাই। কোনো ফলে জলের ভাগ বেশি থাকে। ডাবে খুব বেশি।

রাসু বলল— কিন্তু খেজুর রস কি ফল থেকে পাই? ওটা তো গাছের রস!

দিদি বললেন — ঠিক বলেছ। তারপর একটু ভেবে বললেন— গাছের ফুল থেকে ফল হয়। ফলের একটা আবরণ থাকে। মানে, খোসা থাকে। কিছু গাছের রসও আমাদের খাদ্য।

পরাগ বলল— দিদি, ডাব সারা বছর পাওয়া যায়। খেজুর রস শুধু শীতকালে।

— হ্যাঁ। কিছু ফল সারা বছরের, কিছু গরমের, কিছু শীতের। কিছু আছে কাঁচায় আনাজ। পাকলে ফল।

কর্মা বলল— জানি দিদি। পেঁপে, কাঁকুড়। শশাটা আবার

উলটো। কচি থাকলে ফল। পেকে গেলে মা রান্না করে। শ্রাবণী বলল--- আমের কথা বললি না? কাঁচা আমের ঝোল খাস না বুঝি? রাসু বলল--- আমরা লিখব? কোনটা কোন সময়ের? কোনটা কাঁচায় সবজি, পাকলে ফল?

--- লিখবে তো বটেই। কোনটার কেমন স্বাদ তাও লেখো। কোনটার কী উপকার তাও লেখো।

হৈমন্তী বলল— আগে বাড়ির বড়োদের সঙ্গে, তারপর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে নেব তো?

— হ্যাঁ! কবিরাজদাদুর কথাও ভুলবে না। তাঁর সঙ্গেও কথা বলবে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কোন ফল কোন ঋতুতে হয়? কাঁচা খায় না পাকা খায়? খাওয়ায় কী উপকার? নীচে লেখো:

নাম	কোন ঋতুতে হয়	কী অবস্থায় আনাজ	কী অবস্থায় ফল	খাওয়ায় কী উপকার
আম	বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা	কাঁচা	কাঁচা, পাকা—দুটোই	

যে সব ফল খাবার নয়

অনেক বছর আগের কথা। কেতকীর ঠাকুরদার মা তখন ছোটো। পাড়ার সিধু সোরেন জঙ্গলে গিয়েছিলেন মধু আনতে। মধুর সঙ্গে কয়েকটা অচেনা ফল নিয়ে ফিরেছিলেন। জামের মতো দেখতে। কেউ আগে দেখেনি। সিধু নিজে খায়নি। কিন্তু রান্না ভাতটুকু ছেলেকে দিয়ে সিধুর মা ওই জাম খেয়েছিলেন। তারপর কী পেটব্যথা! শহরের হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছিল।

সবাই জানে সেকথা। বড়োঠাকুমার কাছে কেতকীও শুনেছে অনেকবার। তাই সে বলল— দিদি, বিষফলও

তো আছে?

নরেন বলল— বিষ কী?

— যা একটু খেলেই শরীর খারাপ হয়। হাত-পা অবশ হয়ে যায়। বেশি খেলে মানুষ মরেও যেতে পারে।

হাসান বলল— আম যে বিষ নয় তা কী করে জানা গেল?

— মানুষ খেয়ে দেখেছে। যেটা বিষফল সেটা খেয়ে অসুখ হয়েছে। কেউ মারা গেছে। আবার কখনও দেখেছে সেসব ফল খেয়ে পশু-পাখিরা মারা গেছে। তাই দেখে মানুষ শিখেছে। পরে অন্যরা আর তা খায়নি।

দয়াল বলল— এভাবে তো অনেকে মারা গেছে!

কেতকী বলল--- অনেকদিন আগে তাই না? বড়োঠাকুমারা যখন ছোটো সেই সময়।

— তারও অনেক আগে। তোমার বড়োঠাকুমা ছোটো ছিলেন সত্তর-আশি বছর আগে। কোনগুলো বিষফল তা তখন জানা। মানুষ ফল চিনতে শিখেছে অনেক আগে। তখন কেউ চাষ করতে জানত না। রান্না করতে জানত না।

একথা শুনে কেতকী সিধুর মায়ের গল্পটা বলল।

শুনে দিদি বললেন— দু-একটা বিষফলের কথা এখনও অজানা থাকতে পারে। তাই অচেনা ফল খেয়ো না।

আমিনা জানতে চাইল—
কোন কোন ফল বিষ?
--- কিছু কিছু বিষফলের গায়ে কাঁটা আছে। তবে কাঁটা নেই এমন বিষফলও হয়। এসব নিয়ে বাড়ির বড়োদের জিজ্ঞেস করো। আর কী কী বিষফল আছে তাও জেনো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কী কী বিষফলের নাম জানা গেল? নীচে লেখো, ছবি আঁকো। কোনগুলোর গায়ে কাঁটা আছে তাও লেখো:

বিষ ফলের নাম ও ছবি	কাঁটা আছে কি	বিষফলের নাম ও ছবি	কাঁটা আছে কি

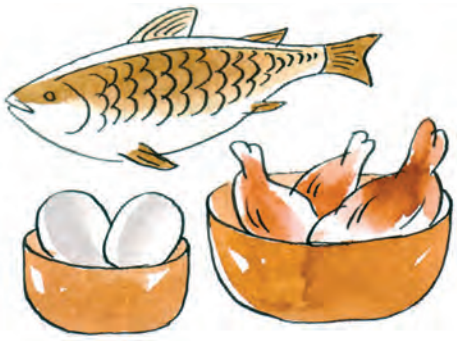

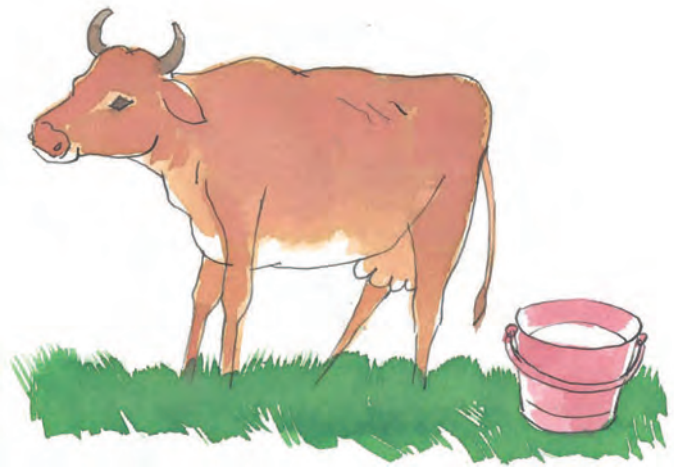

প্রাণীজ খাবার

রমেশ ডিম খেতে খুব ভালোবাসে। ডিম সিদ্ধ। ডিম ভাজা। সবই রমেশের খুব পছন্দ। মাছের মতো কাঁটা বাছতে হয় না। মাংসের মতো দাঁতে আটকায় না। এজন্য

অনেকেরই ডিম পছন্দ। যেদিন দুপুরের খাওয়ায় ডিম থাকে সেদিন খুব মজা।

তবে লুৎফার আবার মাছ পছন্দ। রুই, মৃগেল, ট্যাংরা, বেলে, ইলিশ সব মাছ ভালোবাসে। লুৎফার চাচারা পুকুরে মাছচাষ করেন। বর্ষার শুরুতে ছোটো ছোটো পোনা ফেলেন পুকুরে। খাবার দেন নিয়মিত। তিন মাস পর থেকেই জাল দিয়ে পুকুর থেকে মাছ ধরা শুরু করেন।

এদিকে ডমরু মাংস পেলে আর কিছু চায় না। তাপসের ছোটোবেলার অভ্যেস শেষপাতে একটু দুধ-ভাত খাওয়া। আকবরের সর্দি-কাশির ধাত। তাই ওর মা ওকে রোজ সকালে মধু খেতে দেন।

এসব শুনে দিদিমণি বললেন—

নানা প্রাণী থেকে আমরা এসব খাবার পাই। তাই এগুলোকে বলে প্রাণীজ খাদ্য।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কোন প্রাণীদের থেকে নানারকম প্রাণীজ খাবার পাওয়া যায়? ওই প্রাণীদের কীভাবে পালন করা হয়? নীচে লেখো:

খাদ্যের নাম	ডিম	মাছ			
কোন প্রাণীদের থেকে পাই	মুরগি, হাঁস				
ওই প্রাণীদের কোথায় পালন করা হয়					
ওই প্রাণীরা কী কী খায়					

দুধ, দই, ছানা

চিনু ছোটোবেলায় খুব রোগা ছিল। তখন থেকে ওর মা রোজ ওকে ছানা খাওয়ান। রিঙ্কু দই ভালোবাসে। নেমন্তন্ন বাড়ির মজাই হল চিনি দিয়ে পাতা দই, রসগোল্লা আর সন্দেশ। রিঙ্কুর মা দুধে কফি মিশিয়ে খান। ওর ভাই পম ক্রিম বিস্কুট, কেক আর চকোলেট খেতে চায়। আইসক্রিম বা মালাই বরফ পেলেও খুব খুশি।

ওদের কথা শুনে দিদিমণি বললেন— যা যা বলেছ তার সবই দুধ থেকে তৈরি। তবে দুধের সঙ্গে কিছু কিছু জিনিস মেশাতে হয়। কম-বেশি গরম বা ঠান্ডা করতে হয়।

রেহানা বলল— ছানা করতে গেলে দুধ গরম করতে হয়। আইসক্রিম করতে গেলে ঠান্ডা করতে হয়।

ভাজা খাবার

কেক-চকোলেটের মতো আরো কত কিছু দোকানে পাওয়া যায়। চানাচুর, নানারকম চিপস, নিমকি, আরও কত কি! কিনেই খাওয়া যায়। খুব মুখরোচক।

কিন্তু, তামিমের মনে একটুও সুখ নেই। যেই একটু চানাচুর খেতে যাবে অমনি ওর নানা ডাকবেন। বলবেন— ওগুলো অনেকদিন আগে ভাজা। পুরোনো তেলের গন্ধ। ওগুলো বিষের মতো। তার চেয়ে বরং বাড়িতে চপ-বেগুনি ভাজা হোক। মুড়ি দিয়ে খাও।

এসব শুনে ক্লাসের সবার হলো মুশকিল। পিন্টু দিদিমণির কাছে জানতে চাইল--- চানাচুর অনেকদিন আগে তেলে ভাজা?

— হ্যাঁ। তেলেই ভাজা। তবে কিছুদিন আগে ভাজা তো বটেই।

আয়েষা বলল—এক প্যাকেট চানাচুর বেশ কিছুদিন চলে।

— ওরা এমন কিছু মেশায় যাতে কিছু বেশিদিন ভালো থাকে।

কেতকী বলল— বাড়িতে গরম তেলে ছেঁকে ভাজাপিঠে হয়। তাও বেশ কয়েকদিন ভালো থাকে।

দিদি বললেন— ঠিক বলেছ। দোকানে নিমকি, চানাচুর, আলুভাজার প্যাকেট পাওয়া যায়। ময়দা, বেসন, ডাল থেকে এসব তৈরি করে প্যাকেট করা হয়। তারপর বিক্রি হয়। দু-তিন মাস ভালো থাকে। কখনও আবার প্যাকেটে তারিখ লেখা থাকে। কত দিনের মধ্যে খেতে হবে। এসব জিনিস কেনার সময়ে ওই তারিখটা অবশ্যই দেখে নিও।

লক্ষ্মীমণি বলল— পাঁউরুটিও কি ভাজা খাবার?

— না, তেলে ভাজা নয়। পাঁউরুটি অন্যভাবে তৈরি করা। আগুনে সেঁকা। দু-তিন দিন ভালো থাকে। তারপর একটু

থেমে বললেন--- আগে থেকে খাওয়ার যোগ্য করে আরো অনেক কিছু প্যাকেট করে বিক্রি করা হয়। সেগুলোকে তৈরি খাবার বলে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নানাধরনের প্যাকেট করা তৈরি খাবারের নাম লেখো। কী দিয়ে কোনটা তৈরি হয় তাও লেখো:

খাদ্যের স্বাদ	খাদ্যের নাম	কী কী দিয়ে তৈরি হয়
মিষ্টি		
নোনতা		
টক		
টক-ঝাল-মিষ্টি		

উনুন আর আগুন

বাড়িতে রোজ রান্না হয়। কিন্তু দিদিমণি বলছিলেন অনেকদিন আগে নাকি লোকে রাঁধতে পারত না! তেল-মশলার ব্যবহার জানত না। কমল বলল— মানুষ তখন কী করে খেত?

দীপু বলল--- বেগুন পোড়া খাসনি? ওইরকম পুড়িয়ে খেত!

আয়ুব বলল— যা পুড়িয়ে খাওয়া যায় না, তা খেত না?

কেতকী বলল— খাবে না কেন? কাঁচা খেত।

হীরা বলল— কিন্তু রাঁধতে শেখেনি কেন? কড়া ছিল না?

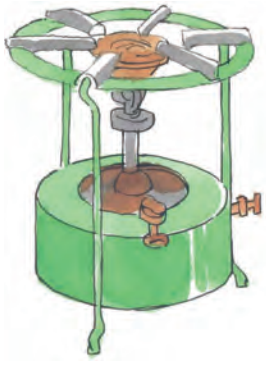

কেতকী বলল— নাকি উনুন ছিল না? আমি জানি, বড়োঠাকুমাদের ছোটোবেলায় গ্যাসের উনুন ছিল না।

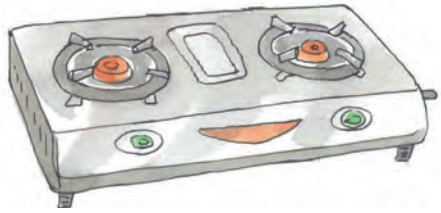

ফতেমা বলল— গ্যাসের উনুন না থাকলে রান্না হবে না? আমাদের বাড়িতে এখনও গ্যাসের উনুন নেই। কাঠের উনুন, কয়লার আঁচ অথবা কেরোসিনের স্টোভে রান্না হয়।

এসব শুনে দিদিমণি একটু হাসলেন। বললেন— আগুন জ্বালাতে পারত কিনা সেটা ভেবেছ? তোমাদের বাড়িতে কীভাবে আগুন জ্বালানো হয়?

ডমরু বলল— দেশলাই কাঠি দিয়ে। দেশলাই বাক্সের গায়ে কাঠির বারুদ ঘষলেই আগুন জ্বলে ওঠে।

— বাক্সের গায়ে কী থাকে দেখেছ?

ডমরু বলল— দেখেছি। বাক্সের গায়েও বারুদ। যেদিকে বারুদ নেই সেদিকে ঘষলে জ্বলে না।

— বাঃ! তুমি তো খুব ভালোভাবে দেখেছ! আর কী করে আগুন জ্বালানো যায়?

টিপাই সাধারণ লাইটারের কথা বলল। ফতেমা গ্যাসের উনুন জ্বালানোর লাইটারের কথা বলল। সুজান আগুন থেকে আগুন জ্বালানোর কথা বলল।

ইসমাইল বলল— রান্না করতে পারা বড়ো সহজ নয়। আগুন, উনুন, বাসন, খাবার-দাবার সব দরকার।

দিদি হেসে বললেন— ঠিক তাই। ধরে নাও চাল, মাছ, আনাজ আছে। তবে কাঁচা। ভাত, মাছের ঝোল, তরকারি হবে। আর কী কী লাগবে? সেগুলো নিয়ে কী কী করবে?

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কাঁচা খাদ্য রান্না করতে আর কী কী লাগে? আর কী কী করতে হয়? নীচে লেখো:

কাঁচা খাদ্যের নাম	এর থেকে কী তৈরি হয়	কীভাবে তৈরি হয় (ভাজা, সেঁকা নাকি অন্যভাবে)
চাল, আটা,		
ডাল		
আনাজ		
দুধ		
মাছ		
মাংস		
.....		
.....		

থালা-বাসন

বাড়ি ফেরার সময় কেতকী ভাবতে লাগল। রান্না করার জন্য মানুষ কত কী তৈরি করেছে। কত রকমের বাসন! অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল আরো কত কী! বাড়ি পৌঁছে বড়োঠাকুমাকে সেকথা বলল।

বড়োঠাকুমা সব শুনে বললেন— আগে এসব ছিল না। মাটির বাসন ছিল। মাটির হাঁড়ি, কড়া। পিতলের খুন্তি। পিতল আর কাঁসার গ্লাস, বাটি।

কেতকী অবাক। ভাত রাঁধতে গেলে তো চালে জল দিতে হবে! জল দিলে মাটি গলে যাবে না?

বড়োঠাকুমা হেসে বললেন— হাঁড়ি তো মাটি পুড়িয়ে তৈরি। মাটি দিয়ে তৈরি ইট কী জল লাগলে গলে যায়?

এবার কেতকী বুঝল, মাটি পুড়িয়ে মাটির হাঁড়ি তৈরি। তাই বলল— আচ্ছা, কাঁচা ইট তো একটা কাঠের ছাঁচে তৈরি করে। কাঁচা হাঁড়ি তৈরির ছাঁচটা কেমন?

এবার বড়োঠাকুমার হাসি আর থামে না। একটু পরে বললেন— চলো, পুব পাড়ায়। তোমার পালদাদুদের বাড়ি। সেখানে দেখবে।

পালদাদু চায়ের দোকানের জন্য মাটির ভাঁড় তৈরি করছিলেন। কেতকীকে ভাঁড় তৈরি করা দেখাল।

স্কুলে কেতকী মাটির ভাঁড় তৈরির কথা বলল। দিদিমণি বললেন— ওখানে যে চাকাটা দেখলে, ওটাকে বলে কুমোরের চাকা। যারা ওটা প্রথম বানিয়েছিল তারা তখনকার সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ।

আয়ুব বলল— আগুন জ্বালাতে শেখার পরে মানুষ এসব বানিয়েছে। তারপরে ভাত রান্না করা শিখেছে মানুষ?

— ঠিক বলেছ। পরে পিতল-কাঁসা, লোহার বাসনও তৈরি করেছে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমার বাড়িতে যা যা বাসনপত্র আছে তার নাম লেখো আর ছবি আঁকো:

লোহা ও স্টিলের বাসনপত্রের নাম ও ছবি	পিতল-কাঁসার বাসনপত্রের নামও ছবি	অন্য জিনিস দিয়ে তৈরি বাসনপত্রের নাম ও ছবি

চলল খাবার দেশে-বিদেশে

কেতকী ভাবল চালের কথা। চাল কি তখন ছিল? পরের দিন স্কুলে কেতকী চালের কথা বলল। দিদিমণি শুনে বললেন— ঠিকই বলেছ। তখন চাষ হতো না। বনের গাছে গাছে যা ফলে থাকত তা জোগাড় করতে হতো। তাই রোজ কেউ চাল পেত না।

উত্তম আলু খেতে খুব পছন্দ করে। তাই বলল— আর আলু?

— এদেশে আলু এসেছে মোটে চার-পাঁচশো বছর আগে। অনেক দূরের দেশ থেকে।

আসিফ বলল— কী করে এল?

— জাহাজে করে। সেই দেশ আর আমাদের দেশের মাঝে অথই জলের সমুদ্র। জাহাজে করে সেই সমুদ্র পেরিয়ে মাঝে মাঝে লোক আসত। তারাই আলু এনেছিল।

বৈশাখী আম ভালোবাসে। সে বলল— আর আম?

— আম এদেশেরই ফল। নানারকমের আম হয়।

বৈশাখী বলল— জানি দিদি। আমাদের বাগানেই পাঁচরকম আম হয়।

উত্তম জানতে চাইল— আর কী অন্য দেশ থেকে এসেছে?

দিদি বললেন— এমন অনেক কিছু আছে। এদেশে যা নেই লোকেরা জাহাজে করে তা আনত। সে দেশে যা নেই, তা নিয়ে যেত।

দিদি আরো অনেক কিছু বললেন। বোর্ডে ছয়রকম খাবারের কথা লিখে দিলেন। কোনটা অন্য দেশ থেকে এদেশে এসেছে। কোনটা এদেশ থেকে অন্য দেশে গেছে। সবাই পড়ল। দিদির কথা শুনল। তারপর বুঝল :

আলু: অন্য দেশ থেকে এদেশে এসেছে।

টম্যাটো: অন্য দেশ থেকে এদেশে এসেছে।

আম: এদেশ থেকে অন্য দেশে গেছে।

লঙ্কা: অন্য দেশ থেকে এদেশে এসেছে।

আনারস: অন্য দেশ থেকে এদেশে এসেছে।

গোলমরিচ: এদেশ থেকে অন্য দেশে গেছে।

আগে স্থলভাগে শুধু বন ছিল। বনের ফলমূলের কোনটা খাদ্য তা খেয়ে দেখে বুঝত লোকেরা। নানা জায়গার লোক নানারকম খাদ্য চিনেছিল। দূরের দুটো ডাঙার মধ্যে যোগাযোগ ছিল না। মাঝে ছিল সাগর। অথই জল। অনেক পরে বড়ো জাহাজ তৈরি করতে

শিখল মানুষ। তারপর এক দেশের লোক অন্য দেশে যেতে পারল। সঙ্গে নানারকম খাবারও ছড়িয়ে পড়ল দেশে-বিদেশে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

আম নিয়ে যা জানো নীচে লেখো। দরকারে বড়োদের কাছে জানতে চাও :

নানারকম আমের নাম	সেই আম কোথায় পাওয়া যায়	কোন সময় পাকে	স্বাদ কেমন

পশুপালন আর আগুনের ইতিহাস

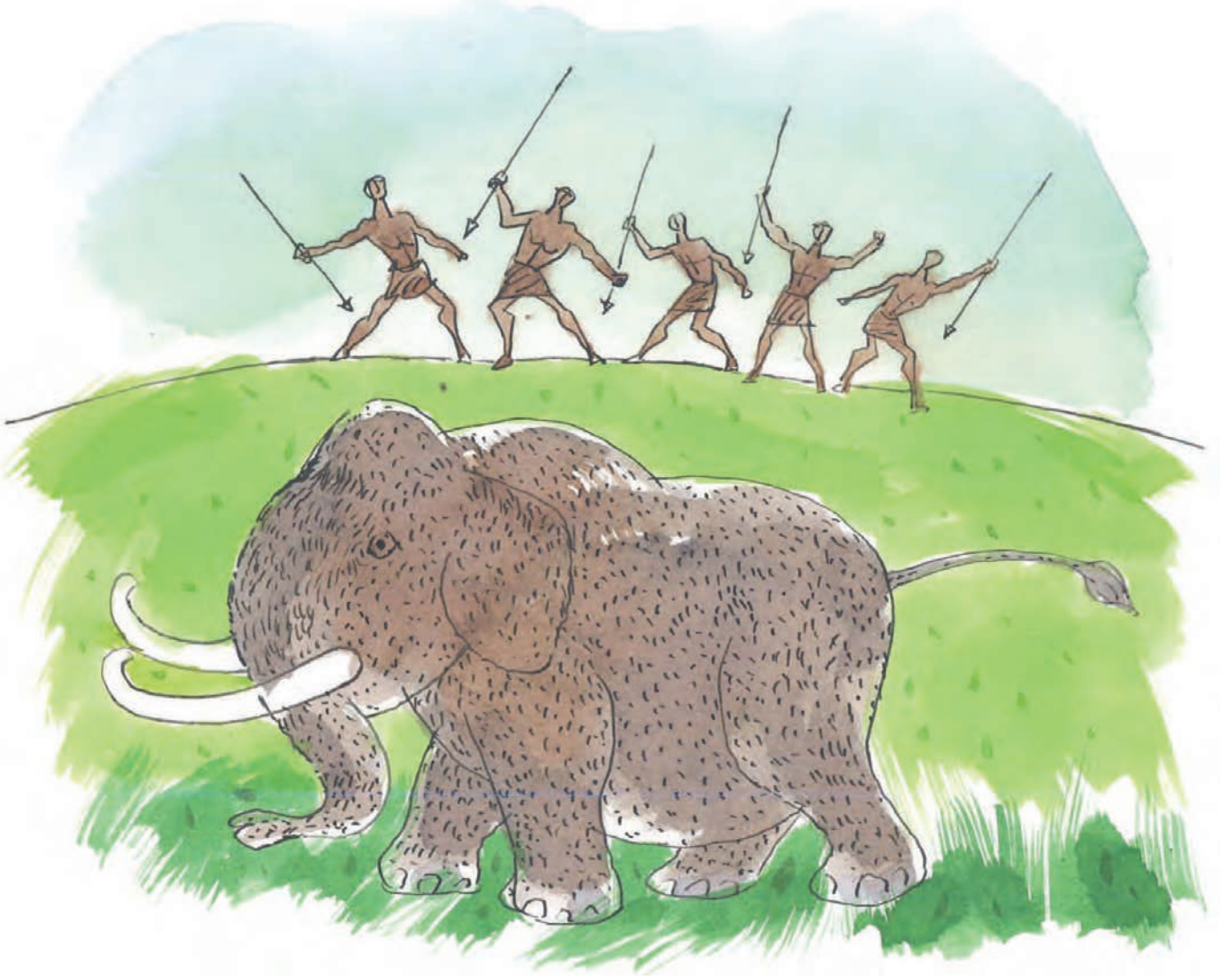

আগেকার দিনে লোকে ভাতের চাল সহজে পেত না। তবে নদী ছিল। নদীর কাছেই ঘরবাড়ি করত। নইলে খাবার জল কোথায় পাবে?

শিকার

কৃষিকাজ

অন্য জলা জায়গাও ছিল। মাছ পাওয়া যেত। বনের জীবজন্তু শিকার করে মাংস পাওয়া যেত। লাঠি, পাথর দিয়ে পশু শিকার করত। তির-ধনুক, বল্লম ছিল না।

এসব শুনে আয়েষা বলল--- আগেকার মানুষ গোরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পুষত না?

দিদিমণি বললেন— প্রথম দিকে পুষত না। কোন জন্তু পোষ মানবে তা তো বোঝেনি। সেটা বুঝতে পারার পর পশুপালন শুরু হয়।

রিম্পা বলল— আর ফলমূল?

— বনের ফলমূল কুড়িয়ে আনত। গাছ থেকে পেড়ে আনত। যখন যা পেত তাই খেত।

টিকাই বলল— সবই কাঁচা খেত?

— প্রথমে আগুনের ব্যবহার জানত না। তখন সবই কাঁচা খেত। পরে আগুনের ব্যবহার শিখল। তখন কিছু কিছু জিনিস আগুনে পুড়িয়ে খেত।

ইতু বলল---আগুন জ্বালাত কীভাবে? দেশলাই তো ছিল না!

— প্রথম দিকে আগুন জ্বালাতে পারত না। ঝড় হলে বনের গাছের শুকনো ডালে ডালে ঘষা লাগত। আগুন জ্বলে যেত। সেই কাঠ এনে রাখত। একটা কাঠ থেকে আর একটা কাঠ ধরিয়ে নিত।

রবীন বলল— নিভে গেলে আর জ্বালতে পারত না?

— ঠিক তাই! অপেক্ষা করত। কবে আবার জ্বলন্ত কাঠ পাবে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

আগেকার মানুষের খাবার জোগাড় করা আর রান্না করা বিষয়ে তোমার নানারকম ভাবনা নীচে লেখো:

কীভাবে খাবার জোগাড় করত	কী কী খাদ্য পেত (ছবি দিয়েও দেখাতে পারো)	কীভাবে খেত		
		আগুন ব্যবহার করার আগে	আগুন ব্যবহার করার পর পরই	মাটির হাঁড়ি, কড়া তৈরি করার পরে
বনে জঙ্গলে শিকার	হরিণ, গাধা, গোরু, মহিষ			

রংবাহারি পোশাক

দুই স্কুলের মধ্যে ফুটবল খেলা হচ্ছে। জার্সি পরা খেলোয়াড়রা মাঠে। লাল-কালো আর নীল-হলুদ জার্সি। গোলকিপারের ফুলহাতা গেঞ্জি।

অনেকেই খেলা দেখতে এসেছে। টিঙ্কু একটা হলুদ গেঞ্জি পরে এসেছে। ওর দিদি মুন্নি।

সবুজ সালোয়ার, কামিজ পরে এসেছে।

টিঙ্কু দেখতে লাগল অন্যেরা কে কী পরেছে। রঘুদা লুঙ্গি আর কমলা রঙের জামা পরে এসেছেন। সরোজদাদু ধুতি আর ছাই রঙের পাঞ্জাবি পরেছেন। হারানকাকু সবুজ রংয়ের জামা পরেছেন।

হঠাৎ সবাই চেঁচিয়ে উঠল—গো-ও-ও-ও-ল! থতমত খেয়ে টিঙ্কু দেখল পাশে দীপা। বলছে— দেখ দেখ আমাদের স্কুল গোল দিল!

টিঙ্কু বলল —ওহ! আমি হারানকাকুর সবুজ জামাটা দেখছিলাম।

পরদিন ক্লাসে দীপা ঘটনাটা বলল। খুব হাসাহাসি হলো। তপন বলল— খেলা দেখতে গিয়েছিলি, না লোকের পোশাক?

দিদিমণি বললেন — বেশ তো। দেখেছে তাতে দোষ কী ! খেলা দেখাও হলো, পোশাক দেখাও হলো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

গরমের সময়ে লোকে কী কী পরে তা নীচে লেখো:

কাদের পোশাক	পোশাকের নাম	পোশাকের রং	কী দিয়ে তৈরি

পোশাকে যায় চেনা

স্কুল থেকে ফেরার সময় টিঙ্কু বলল--- বলত দেখি দু-দলের দু-রকম জার্সি কেন?

ডমরু বলল— না হলে তো নিজের দলের লোকের কাছ থেকেই বল কাড়বে!

আমিনা বলল— গোলকিপারের আলাদা জার্সি কেন বলত?

মজিদ বলল—হাত দিয়ে বল ধরতে পারে কে? শুধু গোলকিপার। তার পোশাক তো আলাদা হবেই।

রিঙ্কু বলল— হাসপাতালেও ওইরকম। নার্সদের আলাদা করে চেনা যাবেই। ধবধবে সাদা শাড়ি। না হলে সাদা স্কার্ট। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও ইউনিফর্ম থাকে।

তপন বলল— ডাক্তারবাবুরা একটা ঢোলা জিনিস পরেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত। বর্ষাকালে আমরা যেমন রেনকোট পরি অনেকটা সেইরকম।

রিঙ্কু বলল— ওটাকে অ্যাপ্রন বলে।

টিকাই বলল— হোটেলে যাঁরা খাবার পরিবেশন করেন তাঁদেরও আলাদা পোশাক থাকে।

টিঙ্কু বলল— আর পুলিশ? পুরোটাই খাঁকি রঙের পোশাক।

দীপা বলল— না। কলকাতার রাস্তায় অনেক পুলিশের সাদা পোশাক আছে। আমি দেখেছি।

ডমরু বলল— মেলায় বা হাটে গেলেও নানারকম লোকের নানারকম পোশাক দেখা যায়।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নানা কাজের নানা পোশাক। কী কাজে থাকলে লোকে কী ধরনের পোশাক পরে? নীচে লেখো:

কারা পরে	কী কী পরে	কেন ওইরকম পোশাক	পোশাকের রং

ঋতু-বদল পোশাক-বদল

কাজের সময় মানুষ যে পোশাক পরে, অন্যসময় তা পরে না। বাড়িতে কেউ স্কুলের ইউনিফর্ম পরে থাকে না। বাইরে গেলেই অন্য পোশাক।

শীতের সময় অবশ্য স্কুলেও নানা রঙের সোয়েটার পরা যায়। যার যা আছে। মুন্নি ফুল-আঁকা একটা সোয়েটার পরে। বাবাইদা একটা বুক খোলা মোটা সোয়েটার পরে আসে।

শীতের সময় অনেকে নানারকম চাদরও গায়ে দেন। কোনোটা মোটা উলের। কোনোটা খুব সরু উলের। দেখে বোঝা যায় না যে উল দিয়ে বোনা।

বড়োঠাকুমা বলেছিলেন, ওঁদের ছোটোবেলায় দু-একজনের সোয়েটার ছিল। এক ডাক্তারবাবু ছিলেন। কোট আর প্যান্ট পরতেন। সাহেবদের মতো। পাড়ার অন্য লোকেরা শীতে চাদর গায়ে দিত। কেউ কেউ দু-তিনটে জামা পরত।

বৈশাখী, দিদিমণিকে বলল— দিদি, এখন কি আগের চেয়ে বেশি সোয়েটার পাওয়া যায়?

দিদিমণি বললেন— এখন তো সব সিন্থেটিক উল। যত লোকে কিনবে, কারখানায় তত বেশি তৈরি করবে।

সাইনা বলল— কী থেকে তৈরি করে?

দিদি বললেন— খনিজ তেল থেকে। তারপর আবার বললেন— বর্ষাকালে যে বর্ষাতি পরো সেটা সিন্থেটিক। বর্ষাকালে অনেকেই সিন্থেটিক শাড়ি পরেন। তাড়াতাড়ি শুকোয়। কাচলে কোঁচকায় না। সেগুলোও ওই ধরনের তেল থেকে তৈরি হয়।

ওয়াসিম বলল--- গরমের সময় পরার জন্য সুতির কাপড় ভালো, তাই না?

— ঠিক বলেছ। তাহলে পোশাক তৈরির নানারকম উপাদান বিষয়ে জানা গেল।

কোনটা কোন ঋতুতে পরার জন্য, তাও বুঝেছ।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কোন পোশাক কোন ঋতুতে পরা হয় তা নীচে লেখো।

পোশাকের ছবি আঁকো:

পোশাকের নাম	কোন ঋতুতে পরা হয়	কেন ওই ঋতুতে পরা হয়	পোশাকেরছবি

উল, তুলোর হরেকরকম

কেতকী বলল— দিদি খনিজ তেল থেকে কী করে সুতো হয়?

দিদিমণি বললেন— খনিজ তেলে অনেক কিছু মিশে থাকে। তাই খনিজ তেল শোধন করে নেওয়া হয়। তারপর ওই তেল থেকে সুতো তৈরির উপাদান তৈরি করা হয়। তারপর ওই তৈরি করা সুতো দিয়ে কাপড় হয়। বড়ো বড়ো কারখানায় এসব হয়।

বর্তমান পোশাকের উপাদান ও উৎস

আয়েষা বলল— দিদি, কাপাস তুলোর সুতোকেই তো সুতি বলে?

— হ্যাঁ। কার্পাস তুলো।

কেতকী বলল— আমাদের জমিতে তুলোর চাষ হয়।

আসিফের খালু গামছা বোনেন। আসিফ দেখেছে। লাল, সাদা, হলুদ সুতো কিনে আনেন খালু। বোনার পর চেক চেক দেখায়। সে বলল— সুতি দিয়ে গামছাও হয়।

বৈশাখী এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এবার বলল— দিদি, আগে কীসের উল ছিল?

— আগে ভেড়ার লোম থেকে তৈরি উল ছিল। কোনো কোনো ছাগলের লোম থেকেও উল হতো। খুব বেশি পাওয়া যেত না। সেই উল অবশ্য এখনও পাওয়া যায়। তাকে বলে পশম। উল কথাটা আসলে ইংরাজি।

রেহানা বলল— আর সিন্থেটিক উল?

— আসলে ওটাকে বলে ক্যাশমিলন।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কোন পোশাক কীভাবে তৈরি হয় তা নীচে লেখো:

পোশাকের নাম	কী দিয়ে তৈরি	তৈরি করার জিনিসটা কী কী ভাবে পাওয়া যায়

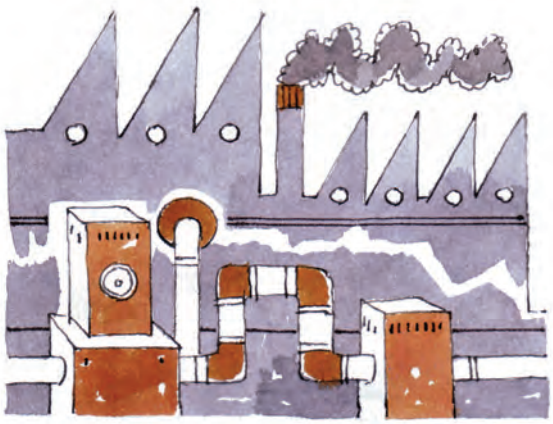

পোশাক তৈরি

ইমরানদের দর্জির দোকান। লোকেরা থান কাপড় আর গায়ের মাপ দিয়ে যায়। দোকানে ওই কাপড় মাপমতন কেটে ওর আব্বা সেলাই করেন। আব্বার কাছে জানতে চেয়েছিল ইমরান— দোকানটা কবে তৈরি? আব্বা বলেছিলেন— আশি-নব্বই বছর আগে। তখন খদ্দরের জামা হতো খুব। খদ্দরের পাঞ্জাবিও তৈরি হতো। এখন বেশির ভাগটাই টেরিকটের প্যান্ট-জামা হয়।

আব্বার কাছে, দাদার কাছে, মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করে ইমরান অনেক জেনেছে। খদ্দর আসলে সুতি। তুলোর মোটা সুতো। বাড়িতেই খদ্দরের থান কাপড়, ধুতি, শাড়ি তৈরি করত অনেকে।

স্কুলে সবাই মিলে কথা হচ্ছিল। বড়ো বড়ো কারখানায় খনিজ তেল থেকে সিন্থেটিক সুতো তৈরি হয়। সেই সুতো থেকে আবার থান কাপড় তৈরি হয়। খনিজ তেল আবার মাটির নীচে থাকে।

সুতির কাপড় তৈরি করাতেও অনেকের কাজ আছে। কার্পাস চাষ, তুলো তোলা। তুলো খুব উড়ে যায়। নাকে ঢুকে গিয়ে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সেই তুলো থেকে সুতো করা। তারপর সুতো বুনে কাপড় তৈরি!

ওদের কাছে এসব কথা শুনে দিদি অবাক। বললেন — তোমরা এতরকম পোশাক তৈরির কথা ভেবেছ? তাহলে বলো, কোন কোন পোশাক তোমরা ব্যবহার করো?

রবিলাল বলল— গরমের সময় সুতির কাপড় পরি।

বৈশাখী বলল— শীতকালে পরি পশমের কাপড়!

--- ঠিক বলেছ। আর কিছু ব্যবহার করো কী না ভাবো। কীভাবে পোশাক তৈরি হয় তা নিয়ে আরও আলোচনা করো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমার ব্যবহার করা পোশাক কীভাবে তৈরি হয় তা নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

পোশাকের নাম	কে কে তৈরি করেন	কীভাবে তৈরি করেন

পোশাকের অতীতকথা

বড়োঠাকুমা একদিন বলেছিলেন, আগে এত সোয়েটার ছিল না। দিদিমণি বলেছিলেন, বড়ো বড়ো কারখানায় সিন্থেটিক কাপড় তৈরি হয়। আগে তো সেগুলোও ছিল না। তখন তাহলে লোকে পরত কী?

এই সব ভেবে বৈশাখী বড়োঠাকুমাকে বলল— তোমরা ছোটোবেলায় কী পরতে?

— তোমার বয়সে আমি শাড়ি পরতাম। ছোটো ছোটো শাড়ি ছিল। তার আগে ইজের ছিল।

— আর ছেলেরা কী পরত?

— তারা ধুতি অথবা লুঙ্গি পরত। আরো ছোটোরা ইজের পরত। মেয়েদের মতোই।

— তোমার ঠাকুরদা-ঠাকুমারা ছোটোবেলায় কী পরত?

— তাঁরা ছোটো থেকেই ধুতি আর শাড়ি পরতেন।

বৈশাখী খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল— আচ্ছা, মানুষ

যখন আগুন জ্বালতে শেখেনি, তখন কী পরত?

বড়োঠাকুমা বললেন--- ওসব তোমার দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করবে।

পরদিন বৈশাখীর প্রশ্ন শুনে দিদিমণি বললেন— তখন জামাকাপড় তৈরি করবে কীভাবে?

টিপাই বলল— তাহলে কী পরত?

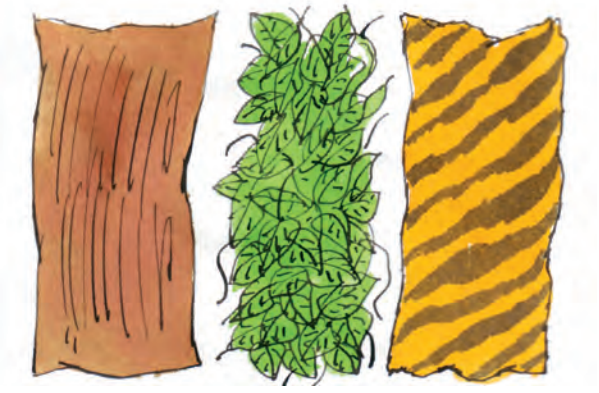

— একসময় কিছুই পরত না। তারপর একবার একটানা অনেকদিন খুব ঠান্ডা পড়ে। যে যা সামনে পায় তাই জড়িয়ে ঠান্ডা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। তখন পশুর ছাল-চামড়া, গাছের ছাল, লতা-পাতা পরা শুরু হয়।

কেতকী বলল— পশুর চামড়া ধুয়ে শুকিয়ে নিত?

ইমরান বলল— মাপমতন কেটে সুচ দিয়ে সেলাই করে নিত?

— কী করে কাটবে? কাঁচিও ছিল না। সুচও ছিল না।

লোহার কথা জানত না কেউ। শুধু কাঠ ছিল, পাথর ছিল।
ওয়াসিম বলল— ওই চামড়া গায়ে জড়িয়ে রাখত কী করে?
— তোমরা নিজেরাই ভেবে বলো দেখি!

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

মনে করো তোমরা অনেকদিন আগেকার মানুষ। খুব শীত পড়েছে। শীত থেকে বাঁচতে হবে। পশুর চামড়া, গাছের ছাল, লতা-পাতা, এইসব জিনিস ছাড়া কিছুই নেই। কী করে তা পরে বাঁচা যাবে তা আন্দাজ করে নীচে লেখো :

পরার জন্য কী কী থাকতে পারে	মানুষ কীভাবে তা ব্যবহার করে থাকতে পারে
গাছের ছাল, লতা-পাতা,	
পশুর চামড়া,	

পোশাকের আরো গল্প

একসময় মানুষ গাছের ছাল জড়িয়ে পরত। আর এখন কত রকমারি পোশাক। কী করে এমন বদল হলো? মাঝে কী ছিল? গাছের ছাল, পশুর চামড়ার পরে কী এল? সবাই ভাবছে।

ডমরু বলল— লতা বুনে পোশাক হতে পারে।

তিতলি বলল— হ্যাঁ। খেজুরপাতা বুনে যেমন পাটি হয়।

আমিনা বলল— একরকম ঘাস বুনেই তো মাদুর হয়।

রমজান বলল— কিন্তু সেলাই করা শুরু হলো কী করে?

মঙ্গলা বলল— মনে হয় সুচের বদলে কাঠি ব্যবহার করত।

দিদিমণি বললেন— মৃত পশুর হাড়কে কাঠির মতো ব্যবহার করত।

ভূতনাথ বলল--- হয়তো গাছের শক্ত আঁশই হতো সুতো।

ওদের কথা শুনে দিদিমণি খুব খুশি। বললেন— প্রথম দিকে এভাবেই হয়েছে। পাট তো গাছের আঁশই। শন নামে আর একরকম গাছ আছে। খুব শক্ত আঁশ।

তিয়ান বলল— শন বুনেও পরত মানুষ?

রিয়াজ বলল— যেমন গামছা বোনে?

— প্রথমে কী আর অত ভালো করে বুনতে পেরেছিল! যা হোক করে জুড়ত।

প্রাচীন মানুষের পোশাক

শীতকালে তিন্নি বিড়ালকে জামা পরিয়ে রাখে। স্কুলে আসার আগে খুলে দেয়। আবার সন্ধ্যায় পরায়। সেকথা শুনে লোকনাথ বলল--- আমরাও পোষা গোরুদের জামা পরাই। চটের জামা। সন্ধ্যায় পরাই। সকালে খুলে দিই।

মঙ্গলা বলল— ওদেরও খুব শীত লাগে, তাই না?

দীপা বলল— শীত ছাড়াও মশা আছে। গোরুরা লেজ দিয়ে মশা তাড়ায়। কিন্তু সারা শরীরে লেজ পৌঁছোয় না। চটের জামা পরালে তেমন মশা কামড়াতে পারে না।

ভূতনাথ বলল— আমার মামারা পোষা টিয়াকেও জামা পরায়।

তিন-চারজন একসঙ্গে বলে উঠল— ইস। তোরা পাখি পুষিস? জানিস না, পাখিদের খাঁচায় রাখতে নেই!

ভূতনাথ থতমত খেয়ে বলল— তাই বুঝি! আমরা না, মামারা পোষে। আচ্ছা, ছোটোমামাকে বলব।

আয়েষা বলল— শীতকালে ছাগলদের খুব কষ্ট। ঠকঠক করে কাঁপে।

ওদের কথা শুনে দিদিমণি বললেন— পশু-পাখিদের গায়ে লোম বা পালক আছে। তাতে শীত কিছুটা কমে।

তিন্নি বলল— দিদি, শালিখ পাখিরা শীতকালে পালক ফুলিয়ে রাখে।

— বাঃ! সেটাও লক্ষ করেছ। শীত থেকে বাঁচার জন্যই পালক ফুলিয়ে রাখে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

১। কীভাবে ক্রমে মানুষ ভালো করে পোশাক তৈরি করতে শিখল তা আন্দাজ করে নীচে লেখো :

কী কী উপকরণ ব্যবহার করেছে	মানুষ কীভাবে সেগুলো দিয়ে পোশাক তৈরি করে থাকতে পারে
১) গাছের ছাল, পাতা, লতা	

২। শীত থেকে বাঁচতে তোমার চেনা জানা পশু-পাখিরা কী কী করে তা নীচে লেখো :

পশু-পাখির নাম	শীত থেকে বাঁচার জন্য কী করে	নিজে করে, নাকি অন্যের সাহায্য পায়	কার সাহায্য পায়

বৃষ্টি এল ঝেঁপে

খেলা তখন দশ মিনিটও গড়ায়নি। বিমল সবে তিনজনকে কাটিয়ে একটা গোল দিয়েছে। এমন সময় ঝমঝম করে বৃষ্টি এল। সাহিলরা খেলা দেখছিল। তারা দৌড়ে গিয়ে ঢুকল তিনুর ঠাকুরদার বাড়ি। যারা খেলছিল তারাও চলে এল মিনিট দুইয়ের মধ্যে।

সবাই এসে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই বৃষ্টি থেমে গেল। তারপর সবাই বেরিয়ে এল।

সাহিল বলল— ঠাকুরদা, তোমার বাড়িটা আজ আমাদের বাঁচিয়ে দিল!

ঠাকুরদা হেসে বললেন— কী যে বলো দাদা! বৃষ্টি এল বলেই তো আমার বাড়িতে একবার ঢুকলে!

প্রশান্ত বলল— তা অবশ্য ঠিক!

তিনু নরেনের সঙ্গে পড়ত। গত বছর তিনুর বাবা বদলি হয়ে গেছেন। এই বাড়িতে এখন ঠাকুরদা একাই থাকেন।

নরেন বলল— দাদু, তিনুরা এখন কোথায়?

ঠাকুরদা বললেন— পাহাড়ি অঞ্চলে। ছবি আছে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।

ঠাকুরদা একটা ছবি দেখালেন। পাহাড়ের গায়ে একটা বাড়ি। সামনে তিনু দাঁড়িয়ে আছে। পাশে গভীর খাদ। তার উপর একটা ছোটো ব্রিজ। তারপর রাস্তা।

স্কুলে এসে নরেন তিনুদের বাড়িটার কথা বলল। সবাই

দিদিমণির কাছে পাহাড়ের বাড়ি নিয়ে জানতে চাইল। দিদি হেসে বললেন— ছবিটা দেখে নিজেরাই আন্দাজ করে বোঝো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নিজের বাড়ির ছবি আঁকো। আগের পৃষ্ঠার বাড়িগুলোর ছবির সঙ্গে সেই বাড়ির মিল আর পার্থক্য লেখো:

তোমার বাড়ির ছবি	তোমার বাড়ির সঙ্গে ছবির যে-কোনো বাড়ির মিল/ অমিল	
	মিল	অমিল

সহজ করে বোঝা

স্কুল থেকে ফেরার পথে রেশমা জানতে চাইল— বাড়ির ছবিতে কী কী আঁকলি রে? উঠোন, পাঁচিল, সব?

টিকাই বলল— ওসব আঁকা খুব ঝামেলা। শুধু একদিকের দেয়াল আর চাল এঁকেছি।

শেফালি বলল— দরজা, জানালাও দেখাসনি?

নরেন বলল— ওসব তুই আঁকিস। তুই ভালো আঁকতে পারিস।

পরদিন। ক্লাসে শেফালি নিজেদের বাড়ির একটা আঁকা ছবি দেখাল। বাড়ি, দরজা, জানালা, উঠোন, ফুলের বাগান, সবজি-বাগান, পুকুর। খুব সুন্দর ছবিটা।

তিন-চারজন একসঙ্গে বলল— তুই এঁকেছিস?

শেফালি বলল— আমি এত ভালো পারি? কাকা এঁকেছে। সবাই জানে শেফালির কাকা ভালো ছবি আঁকেন।

এসব দেখেশুনে দিদিমণি বললেন— এত ভালো যদি সবাই আঁকতে নাও পারো, তবুও কোথায় কী আছে তা সহজেই দেখানো যায়।

অংশু বলল—কীভাবে?

— চিহ্ন ঠিক করে নিতে হয়। যোগ-বিয়োগের যেমন চিহ্ন দিতে হয় তেমনি।

কাজ	চিহ্ন	জিনিস	চিহ্ন
যোগ	+	দরজা	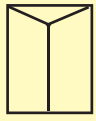
বিয়োগ	−	জানালা	

অ্যালিস বলল— দরজা আর জানালার চিহ্ন কেমন হতে পারে?

দিদি বোর্ডে এঁকে দেখালেন।

শুভম বলল— বুঝেছি। দেখে বোঝা যাবে, কী জিনিস।

— বোঝা গেলে তো ভালোই। না বোঝা গেলেও অসুবিধা নেই। পাশে লিখে দেবে কোনটা কীসের চিহ্ন। তার আগে সবাই মিলে ঠিক করে নেবে চিহ্নগুলো।

বৈশাখী বলল— উঠোন, ফুলের বাগান, সবকিছুর জন্য চিহ্ন ঠিক করে নেব?

— রান্নাঘর, শোওয়ার ঘর, বাথরুম, বারান্দা, সবকিছুর চিহ্ন ঠিক করে নাও। তাহলে বাড়ির সব কিছু দেখানো যাবে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

বাড়ি ও তার আশপাশ বোঝাতে কী কী চিহ্ন ব্যবহার করবে তা ঠিক করো। এবার নীচে লিখে আর এঁকে দেখাও :

জিনিস	চিহ্ন	জিনিস	চিহ্ন	জিনিস	চিহ্ন

সহজ একটা মানচিত্র

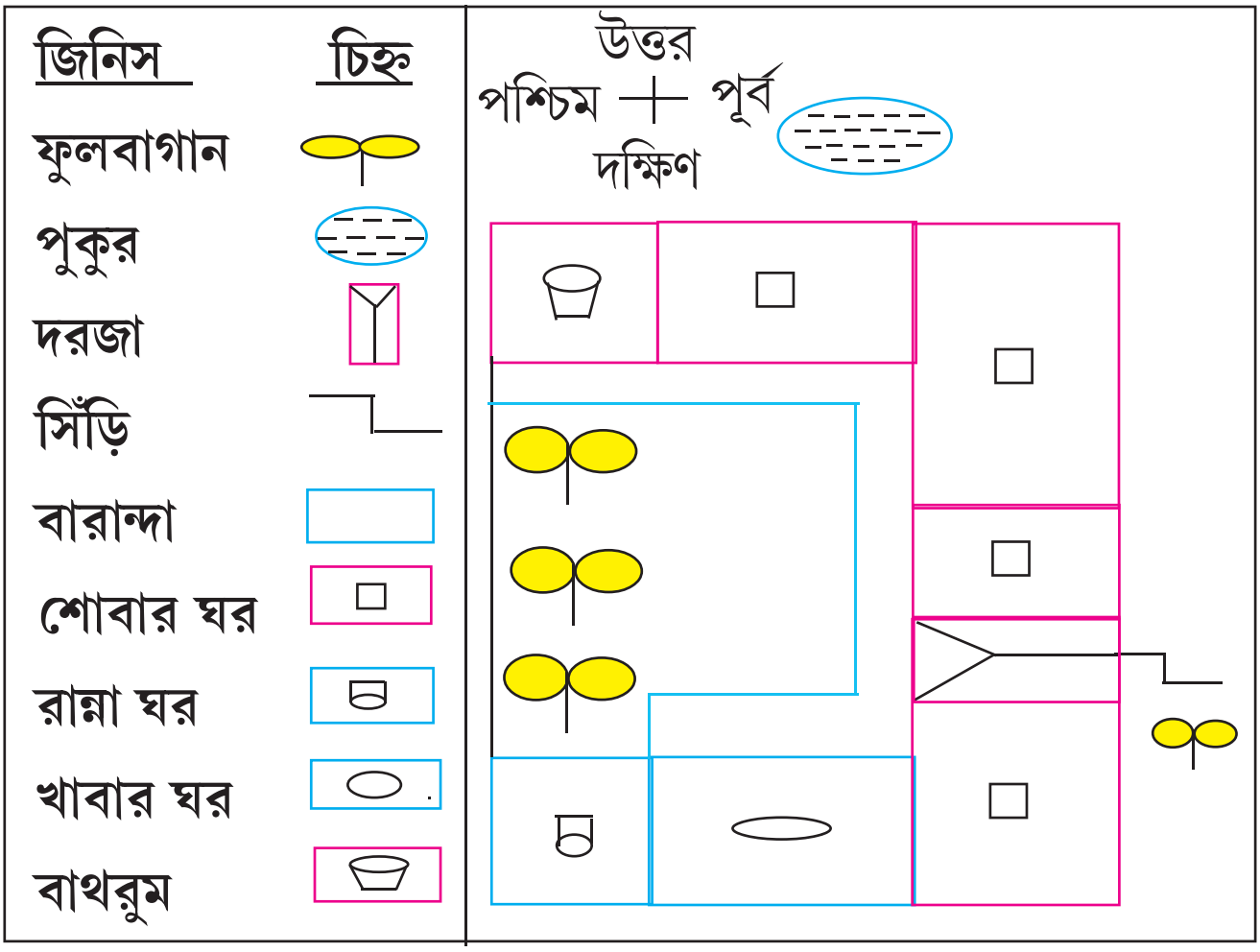

পরের দিন শেফালি নানা চিহ্ন দিয়ে বাড়ির সব কিছু এঁকে দেখাল। দেখতে আগের দিনের ছবিটার মতো সুন্দর নয়। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সব, বরং বেশি। কোথা দিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে, তা দেখা যাচ্ছে। ফুলের বাগান কোথায়,

কোন ঘরটা কীজন্য তাও বোঝা যাচ্ছে। ছবির পাশে কোনটা কীসের চিহ্ন তাও দেখিয়েছে।

সবাই ভালো করে দেখল। শেফালি বলল— এটা কিন্তু কাকা আঁকেনি। আমি নিজে এঁকেছি।

দিদিমণি বললেন— এটাকে কি বাড়ির ছবি বলা যাবে?

সবাই ভাবতে লাগল। হঠাৎ সুহাগ বলল--- দিদি, এটাকেই কি ম্যাপ বলে?

অরুণ বলল— তা কি করে হবে? ম্যাপ তো দেয়ালে যেটা টাঙানো রয়েছে।

— ওটা আমাদের রাজ্যের ম্যাপ। এটা হল বৈশাখীদের বাড়ির ম্যাপ বা মানচিত্র।

কেতকী বলল— রাজ্যের মানচিত্রেও এইরকম চিহ্ন দেওয়া আছে?

— কোনটা কোন জেলা তা এক একটা আলাদা রং দিয়ে দেখানো আছে।

রিঙ্কু বলল— গাছ, পুকুর– এসব তো নেই!

— না ওগুলো নেই। অনেক বড়ো একটা জায়গা ওইটুকু কাগজে দেখানো হয়েছে। একটা গাছ বা পুকুর এত ছোটো যে দেখানো যায় না। একটা জেলা দেখানো যায়। একটু থেমে দিদি আবার বললেন— ম্যাপ কথাটা ইংরাজি। এর বাংলা হলো মানচিত্র। কোন দিকটাকে কাগজের কোনদিকে এঁকেছ সেটা মানচিত্রের উপর দিকে দেখাতে হয়। এ ব্যাপারে সবাই একই নিয়ম মেনে আঁকে।

বৈশাখী বলল— কী নিয়ম দিদি?

— উত্তর দিকটাকে কাগজের উপরের দিকে দেখাতে হয়। সকালের সূর্য তোমাদের বাড়ির কোন দিকে দেখা যায়?

বৈশাখী বলল— গেটের দিকে।

— তাহলে তুমি ঠিকই দেখিয়েছ। ছবির ডান দিক থেকে বাড়িতে ঢোকা দেখিয়েছ। মানচিত্রে ওটাই পূর্বদিক।

এবার পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপটা দেখো।

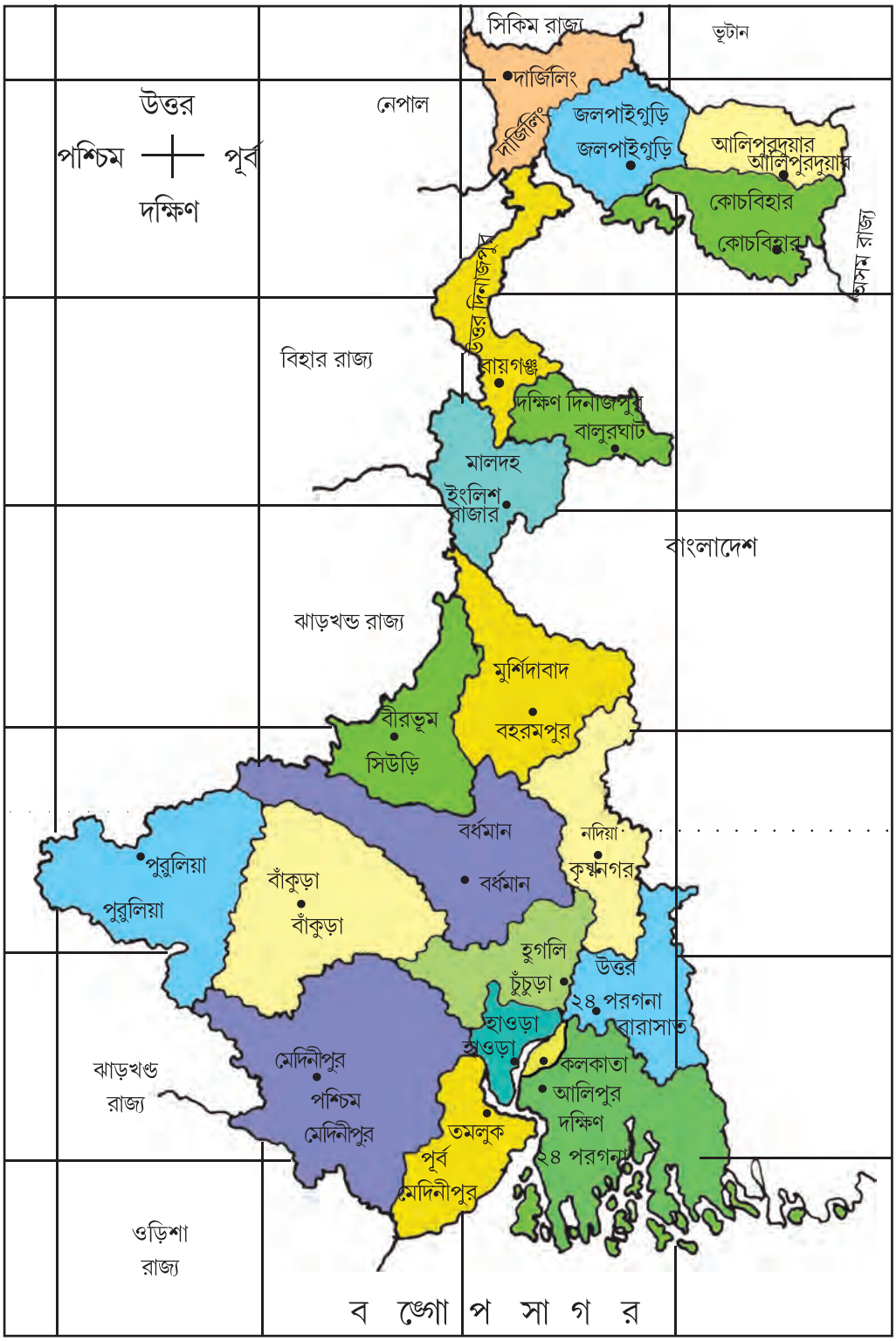

পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র

বাড়ির ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপাদান

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমাদের স্কুলের গেটের কোন দিকে সূর্য ওঠে সেটা দেখো। তারপর স্কুল বাড়িটার একটা মানচিত্র আঁকো:

উত্তর
পশ্চিম — পূর্ব
দক্ষিণ

স্কুল বাড়ির মানচিত্র

মিল-অমিল: নানারকম চিহ্ন

স্কুলের মানচিত্র আঁকা শেষ হতেই ছুটি হলো। সবাই বাড়ি চলল। যেতে যেতে সাহিল ভাবল, বাড়ির আর

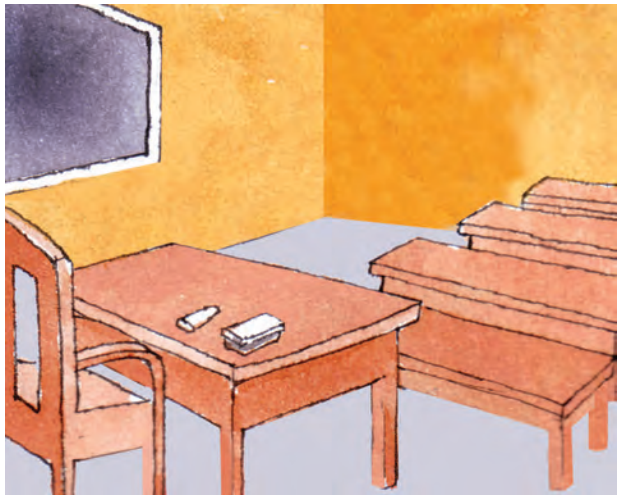

স্কুলের বাইরের দিকটা মোটামুটি একরকম। কিন্তু ভিতরটা অনেক আলাদা।

স্কুলে বেঞ্চ আছে, বোর্ড-চক-ডাস্টার আছে। বাড়িতে তা নেই।

আবার বাড়িতে খাট-বিছানা, আলনা আছে। স্কুলে সেসব নেই।

সাহিল পরদিন স্কুলে দিদিমণিকে বলল--- বাড়ির জিনিসপত্র আর স্কুলের জিনিসপত্র আলাদা। ভিতরের মানচিত্র আঁকতে গেলে আরো অনেক চিহ্ন ঠিক করতে হবে, না দিদি?

দিদি বললেন— ঠিক তাই। যা যা মানচিত্রে দেখানো দরকার সবের জন্য চিহ্ন ঠিক করো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

১। নিজেদের ঘরের ভিতরের আর স্কুলঘরের ভিতরের জিনিসগুলোর জন্য চিহ্ন ঠিক করে নীচে লেখো :

নিজেদের ঘরের ভিতরের জিনিস	চিহ্ন	স্কুলঘরের ভিতরের জিনিস	চিহ্ন

২। তোমাদের ক্লাসঘরের আর বাড়ির যে কোনো একটা ঘরের ভিতরের মানচিত্র নীচে আঁকো:

ক্লাসঘরের ভিতরের	বাড়ির রান্না / শোবার ঘরের ভিতরের মানচিত্র

মিল-অমিলের আরো কথা

বাড়ি ফেরার পথে তর্ক শুরু হলো। স্কুলের ঘর আর বাড়ির ঘরের মিল বেশি, না অমিল বেশি! হঠাৎ পিকু নাটকের ভঙ্গিতে বলল— বেঞ্চি আর খাট। এই তো তফাত! ভেঙে দেখো দুটোই কাঠ। বাইরে আলাদা, ভেতরে সবই মিল।

পিকুর কথা শুনে সবাই হেসে ফেলল। এবার কেতকী বলল— সে তো পাকা ঘর মানেই ইট, বালি, সিমেন্ট।

আয়েষা বলল— জল না দিলে ইট-বালি-সিমেন্ট জমবে কি?

ওয়াসিম বলল— ইট গাঁথার সময় শুধু নয়। পরেও জল লাগবে।

সাহিল বলল— শুধু পাকা বাড়ির কথা কেন? পরেশকাকুদের মাটির বাড়ির কথা ভুলে গেলি?

ইমরান বলল— ফুফুরা যখন পড়ত তখন স্কুলও মাটির ছিল।

রোজ স্কুলে যাওয়া-আসার পথে কী গল্প হলো সেকথা দিদিমণিকে না বললে ওদের শান্তি হয় না। পরদিনও সব শুনলেন দিদি। তারপর বললেন— এখনও অনেকে মাটির বাড়িতে থাকেন।

হারুন বলল— শুধু মাটি? দিদি, অনেক বাড়ি আছে দরমা দিয়ে ঘেরা।

রেবা বলল— কঞ্চির বেড়া তৈরি করে তার উপর মাটি লেপেও দেয়াল করে। তাকে বলে ছিটে বেড়ার দেয়াল।

প্রকাশ বলল— একরকম পাতা সাজিয়ে সাজিয়ে ঘরের চাল করা যায়। আমি ছবিতে দেখেছি।

দিদি বললেন— তাহলে দেখো, তোমরা কত জানো! বাড়ির কতরকমের দেয়াল আর চালের কথা বলতে পারলে। কী কী দিয়ে সেগুলো তৈরি করে তাও জানো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

বাড়ি তৈরির বিষয়ে আরো আলোচনা করো। তারপর নীচে লেখো ও আঁকো :

বাড়ির দেয়াল তৈরির জিনিস	বাড়ির চাল/ছাদ তৈরির জিনিস	বাড়ির ছবি

মানুষ যা গড়েছে

বিকেলে মাঠে চারজন গল্প করছে। কুহেলি, সাইনা, রাবেয়া ও টিকাই।পাতা দিয়ে বাড়ির চাল তৈরির কথা বলল কুহেলি। টিকাই বলল— আমার দাদু বলে, এইসবই তো আগে ছিল! বাঁশ-কঞ্চি, তাল-খেজুরের গুঁড়ি,

বাড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদান

মাটি, বালি, খড়, নানারকম পাতা। টালি, টিন, অ্যাসবেস্টস, ইট, লোহা, সিমেন্ট এসব তো মানুষ পরে তৈরি করেছে।

সাইনা বলল— পাথর তো আগে থেকেই ছিল। মানুষ তৈরি করেনি। পাথরের উপর পাথর বসিয়ে বাড়ির দেয়াল তৈরি করে। জোড়মুখে একটু সিমেন্ট-বালি লাগায়। হরেনকাকু বলেছেন।

রাবেয়া বলল— হ্যাঁ। পাথর কেটে ছোটোবড়ো ইটের আকার দেয়। পাহাড়ি দেশে পাথর দিয়ে ইটের কাজ সারে।

পরদিন স্কুলে গিয়ে ওরা চারজন এসব বলতেই আয়েষা বলল— জলের পাইপ, টিউবওয়েল কী আগে ছিল নাকি? মানুষই তৈরি করেছে।

ডমরু বলল— বেসিন, জলের কলও তাই।

কেতকী বলল— ইলেকট্রিক তার, বালব, ফ্যান।

দিদিমণি ওদের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন— বাড়ি তৈরি করা আর তাকে সুন্দর করার জন্য আরো অনেক কিছু তৈরি করেছে মানুষ! তবে তার অনেক উপাদানই

প্রকৃতি থেকে পাওয়া।

বৈশাখী বলল— মানুষ বুদ্ধি করে সেগুলো বদলে নিয়েছে।

ঘরবাড়ির যুক্তি-তর্ক

একসঙ্গে অনেকে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে। হঠাৎ জেকব বলল— আচ্ছা, বাড়ির কোনটা বেশি দরকারি? ছাদ, না মেঝে, না দেয়াল, না জানালা-দরজা, নাকি অন্য কিছু? একটু ভেবে তনয়া বলল— জানালা না থাকলে দম আটকে যাবে।

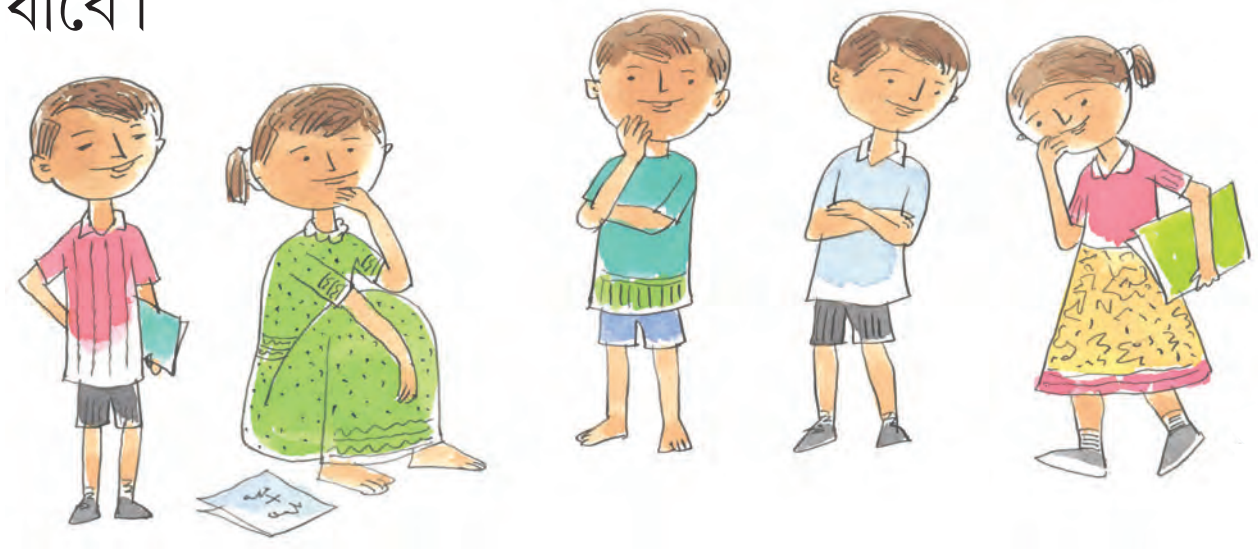

ডমরু বলল--- ছাদ না থাকলে বৃষ্টিতে মুশকিল! ঘুমোচ্ছিস, জেগে দেখলি ঘরের মধ্যে জল থই থই।

সাহিল বলল— দেয়াল লাগবে না? ঘুম ভেঙে উঠে দেখবি রান্না করা খাবার সব বিড়াল-কুকুরে শেষ করেছে।

আমিনা বলল— দরজা না থাকলে তো ভিতরে ঢুকতেই পারবি না।

তনয়া বলল— আবার মেঝে না থাকলে ঘরে জল ঢুকে যায়।

পরদিন এসব শুনে দিদিমণি বললেন— একটা করে ভাবো। কী কী কারণে বাড়িতে সেটার দরকার। ছাদ বা বাড়ির চাল-এর কথা ধরো। কতরকমের ছাদ হয়। আগে ছিল কড়িবরগার পেটানো ছাদ। এখন ঢালাই ছাদ। কারো আবার বাড়ির চাল টালি বা খড় দিয়ে ছাওয়া। তবে ছাদ কী শুধু বৃষ্টি আটকায়?

সাইনা বলল— না দিদি। গরমের দিনে চড়া রোদও আটকায় ছাদ।

— বাড়িতে যা যা থাকে তার সবই দরকার। তবে যেটা না হলে চলবেই না, সেটা মানুষ আগে করেছে।

জেকব বলল— হ্যাঁ দিদি, আগে মাটির বাড়ি হয়েছে। মাটির বাড়ি দেখতে হবে। বোঝা যাবে কোনটা বেশি দরকার।

— যে যা দেখেছ তা ভালো করে ভাবো। অনেকটা বুঝতে পারবে। যাদের মাটি বা দরমার বাড়ি তারা বেশি ভালো বলতে পারবে। বাকিরাও নানারকম বাড়ি দেখে বোঝার চেষ্টা করো, কোনটা বেশি দরকার।

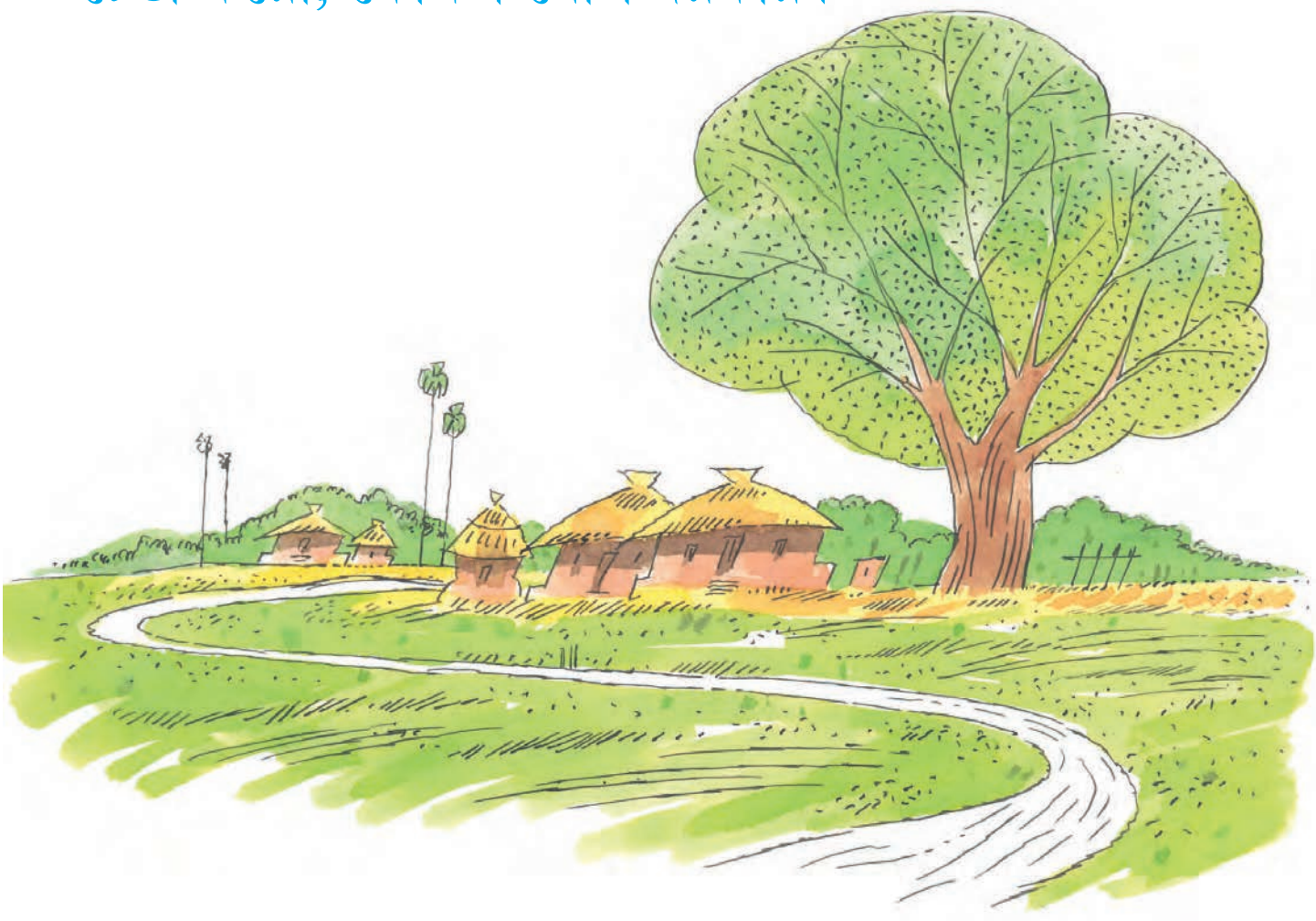

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

১। নিজেদের বাড়ির বিভিন্ন অংশ ভালো করে দেখো। সেই অংশগুলো তৈরি করতে প্রকৃতি থেকে সরাসরি কোন কোন জিনিস কাজে লাগানো হয়। আজকাল তার বদলে কী কী ব্যবহার করা হয়? এবার নীচে সেসব লেখো :

বাড়ির বিভিন্ন অংশ	প্রকৃতি থেকে সরাসরি কাজে লাগানো জিনিস	তার বদলে কী কী কাজে লাগানো হয়
দেয়াল	বাঁশ, তাল-খেজুরের গুঁড়ি , মাটি	ইট, বালি, সিমেন্ট
মেঝে	মাটি	
চাল/ ছাদ	জল-বালি-সিমেন্ট -পাথরেব কংক্রিট, টিন	
জানলা		
দরজা		

২। তোমরা নানান রকম বাড়ি দেখেছ। সেসব বাড়ির নানান অংশের নাম নীচে রয়েছে। সেই অংশগুলো কেন দরকারি? এসব নিয়ে তোমাদের ভাবনা নীচে লেখো :

বাড়ির অংশের নাম	কেন দরকার
দেয়াল	
মেঝে	
চাল/ ছাদ	
জানালা, দরজা, গ্রিল	